দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৩ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা।। ২৬ জুলাই, ২০২১
৯ শ্রাবণ - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩
website : www.eswastika.com

সংকটকালে স্বয়ংসেবকদের সেবাকাজ

Dil main
INDIA
Let's
illuminate
the nation
with
Make in India
SURYA
MADE IN INDIA
LIGHTING | APPLIANCES
FANS | STEEL & PVC PIPES
AATMA NIRBHAR BHARAT KI PEHCHAN
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@surya.in | www.surya.co.in | suryalighting surya_roshni
Tel: +91-11-47108000, 25810093-96 | Toll Free No.: 1800 102 5657

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ৯ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২৬ জুলাই - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

বসুধৈব কুটুম্বকম্ থেকে তৈরি হয়েছে নিঃস্বার্থ দানের ভাবনা □ মৈত্রেয়ী সরকার □ ৬

ধর্মান্তর প্রতিরোধে আজও প্রভু জগদ্বন্ধুর আদর্শ অনুপম দৃষ্টান্ত □ কুশলবরণ চক্রবর্তী □ ৯

সেবার মূল প্রেরণা আধ্যাত্মিকতা □ সত্যনারায়ণ মজুমদার □ ১১

সেবা সাধনায় ভারতীয় নারী □ বিজয় আঢ্য □ ১৩

আত্মীয়তাই হীনমন্যতা দূর করার পাথেয় □ শ্রী সুদর্শনজী □ ১৬

গ্রাম বিকাশ—কল্পনা নয়, বাস্তব □ সুহাসরাও হিরেমঠ □ ১৮

অনুভব কথন □ ১৯

ভারতে মানুষের সেবা মানে ঈশ্বরের সেবা □ প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় □ ২০

অনুভব কথন □ ২৩-৩০

সামাজিক সমরসতা প্রতিষ্ঠায় চাই শীতল মস্তিষ্ক □ শ্রী মোহন ভাগবত □ ৩১

নন্দীগ্রাম...ভালো আছো তো? □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ৩৩

সংকটকালে স্বয়ংসেবকদের একটাই সংকল্প : 'সেবা পরম ধর্ম' □ ড. অনিল নিগম □ ৩৫

সেবার দ্বারা নিজের চিত্তশুদ্ধি হয় □ ড. তিলক রঞ্জন বেরা □ ৩৬

সমাজ সেবা ভারতী প্রান্তিক মানুষের আশ্রয়স্থল □ রিপন দাস □ ৩৮

আয়লা-ফনি-আমফান-যশ সুন্দরবাসীকে সর্বস্বান্ত করেছে □ সৈকত মণ্ডল □ ৪০

অনুভব কথন □ ভুবনেশ্বরী দেবী □ ৪২

অস্পৃশ্যতা যদি দোষের না হয় তবে পৃথিবীতে দোষ বলে কিছু নেই □ বালাসাহেব দেওরস □ ৪৩

সামাজিক সমরসতা ও সেবাকাজের মূর্ত-পুরুষ বালাসাহেব দেওরস □ সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল □ ৪৭

প্রকাশিত হবে ২ আগস্ট ২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২ আগস্ট ২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কবে খুলবে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল-কলেজ?

স্কুল বন্ধ, শপিং মল খোলা। বাস চলছে, লোকাল ট্রেন বন্ধ। পশ্চিমবঙ্গে কোভিড সংক্রান্ত বাধা-নিষেধের ছবিটা অনেকটা এইরকম। বন্ধ রয়েছে রাজ্যের স্কুল-কলেজ। কবে খুলবে সে ব্যাপারে সরকারের তেমন মাথাব্যথা নেই। পড়ুয়ারা বিভ্রান্ত, অভিভাবকরা চিন্তিত। কোনো কোনো স্কুল কলেজে অনলাইনে পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু বেশিরভাগ পড়ুয়াই অনলাইনে অভ্যস্ত নয়। ফলে কাজের কাজের হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের স্কুল-কলেজ খুলবে কবে? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়টা নিয়েই আলোচনা থাকবে। লিখবেন— সাধন কুমার পাল, বিশ্বপ্রিয় দাস, পারুল সিংহ প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-700 071**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সঙ্ঘের স্বভাবের মধ্যে সেবা রহিয়াছে

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের মানসিক ভাব হইল সেবা। যদিও ব্যক্তি নির্মাণই হইল মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূর্তির উদ্দেশ্যে নয়টি দশক ধরিয়া তাহারা কার্যরত রহিয়াছে। সেবাভাব হইল ব্যক্তি নির্মাণের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সঙ্ঘের নিত্যশাখার মাধ্যমে ব্যক্তি নির্মাণ প্রক্রিয়া হইতেই স্বয়ংসেবকরা সেবাভাবী হইয়া ওঠে। সমাজের প্রতি তাহারা একাত্ম হইয়া উঠে। সমাজের সমস্যা, দুর্বলতা, অভাব, ভেদাভেদ ইত্যাদিতে তাহারা ব্যথা অনুভব করে। সেই ব্যথা তাহাদের নিরাশার দিকে নহে, কর্তব্যপরায়ণতার দিকে প্রেরিত করে। মনের মধ্যে সেবাভাব জাগ্রত হয়। সমাজের সেবাভাবী ব্যক্তিদের সঙ্গে লইয়া তাহারা সমাজের দুঃখমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। রাষ্ট্র তথা সমাজের প্রতি একাত্মবোধ তাহাদের সেবাকাজে প্রেরিত করে। দীর্ঘ নয়টি দশকের সাধনায় সেবাকাজ স্বয়ংসেবকদের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। দেশের মধ্যে যে কোনো প্রকার বিপর্যয়ের সময় তাহাদের অন্তঃকরণ কর্তব্যের আহ্বানে জাগ্রত হইয়া ওঠে, তখন তাহারা সেই বিপর্যয় মোকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়ে। ছিয়ানব্বই বৎসর ধরিয়া ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, মহামারী, যুদ্ধ, ভূমিকম্প, দুর্ঘটনায় দুর্ভিক্ষের সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সেবাকাজে ইতিহাস রচনা করিয়াছে। সেই ভয়ংকর দিনগুলিতে দেবদূতের ন্যায় স্বয়ংসেবকরা পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াইতেছে। সমাজ স্বয়ংসেবকদের এইরূপ কাজের জন্য দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছে। লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ বিহারের খরা জনিত দুর্ভিক্ষের সময় স্বয়ংসেবকদের সেবাকাজ দেখিয়া সঙ্ঘকে 'রেডি ফর সেলফ্‌লেস সার্ভিস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইল, বর্তমান সময়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সারা দেশে ১ লক্ষ ৫২ হাজার সেবা প্রকল্পের দ্বারা রাষ্ট্র সেবার শিখা অনির্বাণ রাখিয়াছে।

প্রচণ্ড বিরোধী পরিবেশের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকরা তাহাদের সেবাযজ্ঞ প্রজ্বলিত রাখিয়াছে। ১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তাহাদের সেনাবাহিনীকে যে সর্বোতভাবে সহযোগিতা, তাহা তৎকালীন সেনা আধিকারিকরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি আয়লা, ফনি, আমফান, যশ ও করোনার মতো মহামারীর দিনগুলিতে স্বয়ংসেবকরা প্রাণের ঝুঁকি লইয়া সর্ববিধ সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে পাহাড় হইতে দক্ষিণে সাগর অবধি সর্বত্র স্বয়ংসেবকরা মানুষের পশে দাঁড়ায়াছে।

শুধু প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্যসৃষ্ট বিপদের দিনে নয়, প্রয়োজনানুসারে সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থায়ী সেবাকাজও স্বয়ংসেবকরা দাঁড় করাইয়াছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বচ্ছতা, ছাত্রাবাস পরিচালনা, রক্তদান শিবির, রোজগার যোজনা প্রভৃতি নানাদিকে স্বয়ংসেবকরা তাহাদের প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া লইয়াছে। এককথায়, নর সেবাই নারায়ণ সেবা—এই ভাবকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বয়ংসেবকরা সেবাভাবে তৎপর রহিয়াছে। সেবাকে তাহারা সাধনার অঙ্গ করিয়া লইয়াছে। তাহারা নিজেরা প্রচারের আলোয় আসিতে চাহেন না। এই রাজ্যের প্রচারমাধ্যমগুলিও স্বয়ংসেবকদের প্রচারের আলোয় আনিতে চাহে নাই। ইহাতে স্বয়ংসেবকদের কিছু মনোবেদনা নাই। তাহারা আর্ত-পীড়িত দেশবাসীর সেবাকে নরনারায়ণ সেবা বলিয়া জানিয়া সেই কাজেই মগ্ন রহিয়াছে। সেবাকেই তাহারা ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

সুভাষিতম্

নান্নোদকসমং দানং ন তিথির্দ্বাদশী সমা।

ন গায়ত্র্যাঃ পরো মন্ত্রো ন মাতুর্দেবতং পরম্।।

অন্ন ও জল দানের সমান দান নেই, দ্বাদশীর সমান তিথি নেই, গায়ত্রীমন্ত্রের থেকে বড়ো কোনো মন্ত্র নেই এবং মায়ের চেয়ে বড়ো কোনো দেবতা নেই।

বসুধৈব কুটুম্বকম্ থেকে তৈরি হয়েছে নিঃস্বার্থ দানের ভাবনা

মৈত্রেয়ী সরকার

জগদ্‌গুরুং আদি শঙ্করাচার্য সনাতন হিন্দুধর্মকে বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ ও অবক্ষয় থেকে পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে প্রথম যে হিন্দুধর্মের দর্শনের উপর জোর দিয়েছিলেন তা হলো অদ্বৈতবাদ। জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিষয়ই একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। জগৎ ও জীবনের যা কিছু আছে তার প্রত্যেক উপাদান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলেই সেখানে লিমিটেশন বা দ্বৈতবাদ এসে যায়। জীবন এই পরমব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি, ফলে মাতা ও সন্তানের মতোই এই সূর্য-তারা- চাঁদ-গ্রহ-নক্ষত্র, সমুদ্র-নদী- গাছপালা, এককোষী থেকে জটিল প্রাণী সমস্ত কিছুর সঙ্গেই রয়েছে মানুষ নামক পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত বিচিত্র জীবের অদ্বৈত অভেদ সম্পর্ক। আর হিন্দুধর্ম আসলে সেই অদ্বৈতবাদেরই অভিযোজিত রূপ মাত্র।

হিন্দুধর্মের আদি নাম সনাতন ধর্ম। সনাতন শব্দের অর্থ যা কিছু আদি, অনন্ত, চিরকালের নিরবচ্ছিন্ন, চিরন্তন, প্রবহমান ও অনিঃশেষ। এই প্রবহমান অনন্তের কথা বলতে গিয়েই বৈদিক ঋষিরা বলেছেন চুরাশি ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম মৃত্যুর মতোই হিন্দুধর্ম আদি ও অনন্ত। এর সৃষ্টি বা ধ্বংস কোনোটাই সম্ভব নয়। তাই কেউ ধর্ম পালটে হিন্দু হতে পারে না, আবার কেউ চাইলেও হিন্দুত্ব ত্যাগ করতে পারে না। কারণ হিন্দুত্ব শরীরতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক সত্যের সঙ্গে জড়িত। বেদে বলা আছে সকল মানুষই হিন্দু— তারা সকলেই যজ্ঞের অধিকারী। তাই প্রতিবারই ধ্বংসের পর তার নবরূপে নির্মাণ হবে। কারণ যা কিছু প্রবহমান চিরন্তন ও অবিনশ্বর তাকে কোনো সীমার ভেতরে বাঁধাই সম্ভব নয়। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যেমন মাপা যায় না আমাদের বিজ্ঞান এমনকী কল্পনা দিয়েও তেমনি সৌরমণ্ডল গ্যালাক্সি ক্লাস্টার সুপার ক্লাস্টার পার হয়ে অবজার্ভার ব্রহ্মাণ্ড পার

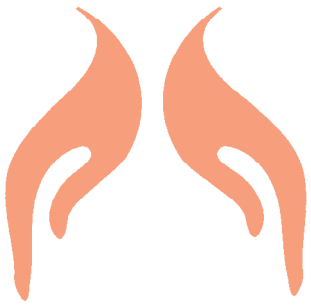

করলে যেমন থেকে যায় এক অচেনা জগৎ তেমনি আমাদের এই মানব শরীরের আসল সত্তা কার হাতে, কেই-বা বিবেক হয়ে মুখোমুখি প্রশ্ন করে তাও আমাদের অজানা। তাই সনাতন বা চিরন্তন এই শরীর ও ব্রহ্মাণ্ডকে কোনো ধর্ম, জাত জাতি, দেশ, ভাষা দিয়ে বাঁধা যায় না, এর প্রকৃতই কোনো রূপ নেই। যেমন আত্মা বা বিবেকের রূপ আমরা জানি না। তাই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন ছিল 'আমি কে?' বিশ্ব ও মানবআত্মার এই যে অভিন্ন বন্ধন, অভিন্ন রূপ— তাকেই শঙ্করাচার্য বলেছেন অদ্বৈতবাদ। তাকেই প্রাচীন ভারত বলেছে 'পিণ্ডের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড'।

মজার কথা হলো, ভারতীয় ঋষিরা হাজার হাজার বছর আগে যে শাশ্বত জীবন সত্যের সন্ধান দিয়েছিলেন তাকে আধুনিক মানুষ ভিক্টোরিয়ান বা মুঘল, তুঘলকি, সুলতানি দৃষ্টিকোণ দিয়ে ধরতে অসমর্থ হয়েছেন। পাশ্চাত্য বলেছে সারভ্যাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট, কিন্তু সেখানে অখণ্ড মানবধর্ম বা অদ্বৈতবাদ নেই। সেখানে একে অপরের সঙ্গে জুড়ে থাকার কথাও নেই, বরং একজনের বা এক গোষ্ঠীর উত্থান হবে আর বাকিরা পিছিয়ে পড়বে। সেই মতাদর্শেই সারা পৃথিবীতে উপনিবেশবাদ এসেছে। সারা পৃথিবীতে প্রথম শ্রেণীর ধনী দেশ, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাঝারি দেশ অথবা আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের মেরুকরণ সম্ভব হয়েছে। একে অপরের সঙ্গে জুড়ে থাকা নয়, বিচ্ছিন্নতাই এর মূল মন্ত্র। বিভাজন ও বৈষম্য যখনই আসছে তখনই সেই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা চলে আসছে। সাম্যবাদও সেখানে একরৈখিক ও এককেন্দ্রিক। সমান অর্থ ব্যবস্থায় সমাজ বণ্টনের কথা থাকলেও একে অপরের সঙ্গে জুড়ে থকার কথা, প্রকৃতির সঙ্গে জীবজন্তুর সঙ্গে জুড়ে থাকার কথা কোথায়? একনায়কতন্ত্র ও পুঁজিবাদ পশ্চিমি সভ্যতারই মস্তিষ্কপ্রসূত। তাল তাল সোনা দিয়ে গড়া যক্ষপুরীর যে রাজা বা রানি নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করেন, সে আসলে ভোগ ও লোভের রিপুতে আচ্ছন্ন। টাকার পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ে যায় প্রকৃত মনের আনন্দ, প্রকৃত প্রেম ভালোবাসা সেবার মূলমন্ত্র। নষ্ট হয়ে যায় প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষের সঙ্গে জুড়ে থাকার মূল আদর্শ। প্রকৃত আনন্দ অধরাই থেকে যায়।

একাত্মতা বোধ আসলে বিশ্বের প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে অনন্ত প্রেমে নিজেকে জুড়ে নেওয়া— সীমা ভেঙে অসীমের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নেওয়া। প্রাচীনকালে একেই ঋষিরা ধ্যান বা যোগ বলেছেন। পাহাড়, অরণ্য বা মন্দিরে শাম্ভবী মুদ্রায়, বিপাসনায় বা মুদিত নয়নে মনকে দু' চোখের মধ্যে স্থির করাই যোগ বা ধ্যান নয়। এটা যোগের কয়েক লক্ষ মুদ্রার মধ্যে বিশেষ একটা রূপ মাত্র। আসলে যা কিছু কর্ম তার সবকিছুর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার নামই যোগ বা ধ্যান। ধরা যাক, কোনো মেয়ে একমনে ভালোবেসে গাছ লাগাচ্ছে, গাছের যত্ন করছে, তখন গাছ ও মেয়েটির মধ্যে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন তৈরি হচ্ছে। দুটি ভিন্ন রাসায়নিক ভৌতিক উপাদানের মধ্যে এক অভিন্ন এই যে যোগসূত্র নির্মাণ হচ্ছে, তাই

অদ্বৈতবাদ। সেখানে গাছের কষ্ট আনন্দ মেয়েটিও সমান ভাবে অনুভব করছে। একাত্ম মানবতাবোধ তৈরি হচ্ছে। গান, নাচ, ছবি, কবিতা, রান্না, শিল্প, ভাস্কর্য দিয়ে অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি ও তার পাখির কাকলি, ঝরনার তান, এমনকী পাহাড় তার রূপ, নদী তার স্রোতের ভেতর দিয়েই মনের ভাবকে যোগ করে দিচ্ছে অপরের সঙ্গে। অদ্বৈত ভাব তৈরি হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মানবাত্মার। এই পৃথিবীর গাছ, ফুল, পাখি, চাঁদ, তারা, শিশু, প্রজাপতি, এমনকী একটা পিঁপড়ে বা কৃমির সঙ্গেও এই একাত্মতা তৈরি করা সম্ভব। আর তখনই আরও প্রেম জাগবে, আরও আরও সুন্দর ও একাত্ম মনে হবে জগতের সঙ্গে নিজেকে। বৈষ্ণব প্রেম ও ভাগবত আদর্শ সেই কথাই বলে কিংবা বুদ্ধও সেই কথাই বলে গেছেন, একটি কৃমির প্রতিও প্রেম, তাকে হত্যা নয় বরং তার আত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা বলে। এভাবেই আত্মিক যোগের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর সকল ভৌতিক উপাদানের সঙ্গে জুড়ে থাকার, একাত্ম থাকার যে আনন্দ তা পাওয়া যেতে পারে। এভাবেই দ্বৈত সত্তা অখণ্ড সত্তায় রূপান্তরিত হতে পারে। পৃথিবীর উন্নত ও জটিল শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষের পক্ষেই সম্ভব বিশ্বপ্রেমিক হয়ে ওঠা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের সত্তার অংশ হিসেবে নিতে পারলেই অখণ্ড মানবপ্রেমের তত্ত্বের জন্ম হয়।

পুঁজিবাদ, একনায়কতন্ত্র, ধনতন্ত্র এমনকী সাম্যবাদেরও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। সাম্যবাদেরও আদর্শ একমুখী হয়ে যখন স্থির হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে অখণ্ড মানববোধ। কী বিরাট দর্শন এবং নিজস্ব বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা থাকলে তবেই সনাতন ধর্মের ঋষিরা সেই আদিকালেই অখণ্ড মানববোধ নিয়ে ভাবতে পেরেছেন, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি এবং ব্রহ্মাণ্ড এক ও অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাদের মূল মন্ত্রই হলো জুড়ে থাকা, জীবনের প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে জুড়ে থকা। ধরা যাক, শিবের গলায় সাপ জুড়ে আছে, মাথায় চন্দ্র জুড়ে আছে, জটায় গঙ্গা নদী জুড়ে আছে, হাতে রুদ্রাক্ষ জুড়ে আছে, একটু বৈজ্ঞানিক ভবে ভাবলে বোঝাই যায় এগুলো আসলে প্রকৃতিতত্ত্বের সিম্বলিক রূপ। সনাতন ধর্মে প্রতিটি দেব-দেবীর বাহন, অস্ত্রও সেই প্রাকৃতিক সিম্বল। যেমন ময়ূর, হাঁস, পেঁচা, ইঁদুর, বাঘ, সিংহ, মহিষ, ধান, পদ্ম, সাপ, বজ্র, আগুন, তারা, অনন্ত নাগ, বরুণ, নদী, মোরগ, ময়ূরপুচ্ছ, কচ্ছপ, মীন, মকড়, বরাহ, কল্কী অবতারে সাদা ঘোড়া, বিষ্ণুর বাসুকী সবই ভৌতিক প্রাকৃতিক সিম্বলকেই সনাতন ধর্ম জুড়ে দিয়েছে মানুষের মঙ্গলের সঙ্গে, মানবতার সঙ্গে। ছোটোবেলায় গ্রামে আমাদের সাপ মারতে নিষেধ করা হতো, মায়েরা বলতেন, ও শিবকন্যা মনসার বাহন। একই ভাবে বিষ্ণুর অবতার তাই কচ্ছপ খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, গণেশের বাহন তাই ইঁদুর মারা নিষিদ্ধ ছিল। আসলে এভাবেই বাস্তুতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার একটা বৃহৎ চেষ্টা সনাতন ধর্ম করে গেছে। দুর্গাপূজার সপ্তমীতে যে নবপত্রিকা স্নানের রেওয়াজ আছে সেখানে নয়টি গাছ যেমন হলুদ, ধান, বেল, কচুগাছ, অশোক গাছ, বকুল, বট, অশ্বত্থ বা পাকুড় ও কাচ্ছি বা মান কচু আসলে প্রকৃতির ওষুধী উপাদান, খাদ্য উপাদান, অক্সিজেন সরবরাহকারী বৃহৎ বৃক্ষ উপাদানকেই পুজো করা হচ্ছে। পুজো করছে সনাতনীরা সূর্য, চন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, নদী, কৈলাশ পর্বত, নক্ষত্র কিংবা বজ্রদেব ইন্দ্রকে। এভাবেই ক্ষুদ্র মানুষের শ্রদ্ধা বা তর্পণ অর্পণ হচ্ছে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি প্রাকৃতিক উপাদানের উদ্দেশ্যে, ক্ষুদ্রপ্রেম বিশ্বপ্রেমে উন্নিত হচ্ছে।

সনাতন ধর্ম বলছে, যা এই ক্ষুদ্র দেহে আছে তাই দিয়েই ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ হয়েছে। যে পঞ্চ উপাদান বা ফাইভ এলিমেন্ট ব্রহ্মাণ্ডের আদি অর্থাৎ ক্ষিতি,

যাযাবর সমাজের পাশে সমাজ সেবা ভারতী

সন্দীপ জানা

কিছুদিন আগের কথা। কাঁথি জেলায় অবস্থিত খেজুরীর একটি গ্রাম চিঙ্গুরদন্যা। গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে কুলু কুলু বেগে বয়ে চলেছে ওড়িশা কোস্ট ক্যানেল। পাশেই খানিকটা ফাঁকা জায়গায় বসে সাপ্তাহিক হাট। সারি সারি চালা ঘর। গ্রামের লোকেরা বলে হাটচালা।

সারারাত ঘুরে বেড়ায় একটি যাযাবর গোষ্ঠী, যাদের গ্রামের মানুষ কাকমারা বলে। এই গোষ্ঠীরই মেয়ে কাঞ্চা (কাঞ্চন)। আট বছর আগে পাশের গ্রামের কায়স্থ বাড়ির ছেলে 'ভুবন' জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই নিয়ে অনেক ঝামেলাও হয়। আজ আট বছর পর ফিরে এসেছে ওই যাযাবররা। যাবে কাঞ্চার বাড়িতে দেখা করতে। যাযাবরের মেয়ে কেমন স্থায়ী সংসার করছে, দেখতে। সবাই মিলে কাঞ্চনের বাড়ি যায়। গিয়ে দেখে গোয়াল ভর্তি গোরু, গোলাভরা ধান, পুকুর ভর্তি মাছ। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সংসার। কোনো অভাব নেই। আছে রাজরানির মতো। সবাই ভোজন করে আনন্দ মনে আবার পথে নামে নতুন কোনো আস্তানার ঠিকানায়। পথে সেই হাটচালাতেই রাত্রি বাস করে। যাযাবর হয়েও মেয়ের বাড়ির সংসার, পরিবেশ দেখে সিদ্ধান্ত নেয়, এরকম যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করবে। শুরু করে নতুন জীবন। যা আজকে সিংহ পল্লী নামে পরিচিত। কিন্তু তারা আজও সমাজ, সরকার দ্বারা বঞ্চিত, নিপীড়িত, অবহেলিত। এখন আটচল্লিশটা পরিবার থাকে। তাদের মধ্যে একজন শিক্ষক। দু'জন আইসিডিএস কর্মী। তরুণ-বালক-শিশু মিলিয়ে আটষট্টি জন। হাই স্কুলে পড়ে চার জন, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যায় কয়েকজন। বত্রিশটি পরিবার ভিক্ষাবৃত্তি করে। অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, অপুষ্টি, অভাবের তড়নায় জর্জরিত। এই অবস্থায় এগিয়ে আসে ওই গ্রামের স্বয়ংসেবক বকুলদা ও তাঁর সহধর্মিণী সুজাতা বৌদি। সমাজ সেবা ভারতীর সহযোগিতায় ও সঙ্ঘের সেবা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় শুরু হয় সেবাকাজ। ফিরিয়ে আনতে হবে তাদের সমাজের মূল স্রোতে। ফিরিয়ে দিতে হবে সামাজিক স্বীকৃতি। শিক্ষিত করতে হবে। স্বনির্ভর করতে হবে। বন্ধ করতে হবে ভিক্ষাবৃত্তি। তার জন্য সুজাতা বৌদির অক্লান্ত নিরন্তর প্রয়াস। কখনো খাদ্যবস্তু, বইখাতা, ত্রিপল, চিকিৎসা এবং পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমরা দেখাব সেই নিপীড়িত অবহেলিত মানুষদের নতুন সূর্যোদয়। এটাই আমাদের অঙ্গীকার।

তেজ, বায়ু, মরুৎ, অপ, তা এই ভৌত মানবদেহের অবশ্য উপাদান। এ দেহের সত্তর শতাংশই জল। বাতাস নিঃশ্বাস বা প্রাণের উপাদান। আগুন থেকেই শক্তি বা ক্যালরি। আকাশ অর্থে দেহের পঞ্চাকাশ ও ধরিত্রী অর্থাৎ ভৌত শরীরের বেসিক উপাদান মাংশপেশী হাড় ইত্যাদি। তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানকে শরীরের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের ভেতর পেলে নিজেকে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা ভাবতে দোষ কোথায়?

মজা হলো, পাশ্চাত্যে যে 'আমি'র থিওরি পাওয়া যায় সেখানে আমি হলো ফিজিক্যাল বডি বা শরীর। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই জানি আমি মানে শুধু ভৌত উপাদান নয়, বুদ্ধি, কল্পনা, আবেগ সব আলাদা করেই আমাদের চালিত করে। সনাতন ধর্মে তাই 'আমি'র অর্থ হলো তিনটি সত্তা— শরীর, মন ও মেধা ও আত্মা। বাহ্যিক শরীর থেকে এই সূক্ষ্ম আত্মাকে জানার যে যাত্রা তাকেই বলে যোগ বা ধ্যান। যেখানে শরীরের সঙ্গে মন মেধা ও আত্মার পূর্ণ মিলন সম্ভব হবে। এখানে এসেই পাশ্চাত্যের ফিজিক্যাল বডির সমান্তরাল থিওরি ভেঙে যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমির মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সত্তাকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে তার সারথি এই বিশ্বরূপের সন্ধানই হয়তো দিয়েছেন। যেখানে 'ক্ষুদ্র আমি' বৃহৎ হতে হতে ব্রহ্মাণ্ডের সমান হয়ে ওঠে। ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আত্মার একাত্মবোধ তৈরি হয়। ভারতীয় সনাতন দর্শন বলছে, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'— সেই একাত্মতার কথা, বসুধার সমস্ত এলিমেন্টের সঙ্গে আত্মযোগ তৈরি করা। সমস্ত বসুধা প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় হয়ে উঠবে। সমাজে কোনো বৈষম্যের কথা কিন্তু নেই, কোনো ভেদাভেদ নেই বরং এক সামগ্রিক একাত্মতাই শেষ কথা। গৃহে আগত সবচেয়ে দরিদ্র দানপ্রার্থীকে বলা হচ্ছে দরিদ্র নারায়ণ। অর্থাৎ সমাজের সবচেয়ে দুর্বল হয়ে উঠছে আরাধ্য দেবতা। নিজে না খেয়ে দরিদ্র নারায়ণের সেবা করার মধ্যে একদিকে আত্মিক সংযম বোধ তৈরি হচ্ছে এবং অন্যদিকে ভেদাভেদ মুছে সাম্যবাদের কথা আছে। পাশাপাশি রিপুর আমিত্ব ভেঙে বসুধার প্রাণের সঙ্গে অদ্বৈত কুটুম্বকম্ সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। সনাতন ধর্ম শেখাচ্ছে রিপু সুখ নয়, অন্যকে তৃপ্ত করার মধ্যেই নিজের সার্থকতা। এখান থেকেই নিঃস্বার্থ দানের থিয়োরি এসেছে। পাশাপাশি যে খাদ্য বা অন্নপ্রাণ আমার জীবন ধারণের জন্য প্রকৃতি-মা দিচ্ছেন, বেদ মন্ত্র দিয়ে সেই প্রাণ ধারণের অন্নের স্তুতিগাথা ও পুজো করার কথা বলেছে। প্রথমে প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অন্ন স্পর্শ করে মন্ত্র উচ্চারণ করে তারপর ভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্য ও খাদকের মধ্যে এক অখণ্ড সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যাচ্ছে, অদ্বৈত সত্তা এসে যাচ্ছে। খাদ্য আমার দেহে গিয়ে নিজেকে ভেঙে যে তেজ বা শক্তি তৈরি করছে তা প্রাণশক্তি হয়ে উঠছে। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ড ও প্রকৃতির শক্তি দেহের শক্তির সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে, ব্রহ্মাণ্ড সত্তার গভীরে এসে মিশে এক অখণ্ড মানবতা তৈরি হচ্ছে।

আচার্য শঙ্কর বলেছেন, 'একম' ও 'অদ্বিতীয়ম্'। অর্থাৎ এক এবং অভিন্নতাই আসলে মানবতাবোধের একমাত্র সূত্র। এই সূত্র দিয়েই শুধু নিজের দেশ, জাতি বা সম্প্রদায় নয় বরং সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে একসূত্রে বেঁধে নেওয়া সম্ভব। তাহলেই সমস্ত হানাহানি, যুদ্ধ, অভাব, হিংসাকে দূর করা সম্ভব। মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আকৃতি আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

সনাতন ধর্মের সত্য হলো 'একম মনুষ্য সাগরস্য সমানম্'! অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই রয়েছে অনন্ত অতল সমুদ্রের রহস্য। একটু ভেবে দেখলে মনে হয় সত্যিই তো, আমরা নিজেকে নিজেরাই কতটাই বা চিনি? নিজেকে কতটুকুই বা আবিষ্কার করে উঠতে পেরেছি? প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র অনুভব, বিচিত্র কল্পনা ও বিচিত্র স্বপ্ন আমাদের ঘিরে বয়ে চলেছে, কোথা থেকে আসে এই চিন্তার ঢেউ, বিবেকের টানাপোড়েন? সে তো আমার ফিজিক্যাল বডি নয়! সে কী আমি নাকি অন্য কেউ! যে নাড়া দিয়ে যায় গড়পড়তা থোড় বড়ি খাড়ার জীবনে, সে অন্তরে আসলে বিপুল তেজ অনুভব করি, সেই কি অন্তরাত্মার ঈশ্বর? এই আড়শি নগরের পড়শীকে আমরা চিরকাল ধরেই অনুভব করেও সঠিক চিনে উঠতে পারি না। আর সনাতন ধর্ম এই মহান আত্মাকেই ঈশ্বর বলেছে। তাই বিচিত্র এই প্রাণের তরঙ্গ জুড়ে যায় মহাবিশ্বের সঙ্গে, অনন্তের সঙ্গে। একাত্ম হয় প্রকৃতি ও মানব। পিণ্ডের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড। এই ঐতিহ্য আমাদের পূর্বপুরুষের আবিষ্কার। সনাতন ধর্ম আসলে সনাতনী বা চিরকালীন বিজ্ঞান। এই চিরকালের বিজ্ঞান ও মহান উদার দর্শনের উত্তরাধিকার আজ আমরা বহন করছি। আমরা ধন্য এমন উদার মানবিক সংস্কৃতির জিন বহন করে। আমরাই পৃথিবীর প্রাচীনতম সর্বাধুনিক বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য- শিল্পের উত্তরাধিকারী। অখণ্ড সনাতন ধর্মকে সমগ্র বিশ্বের ভোগবাদের বিপরীতে ছড়িয়ে দেওয়া আমাদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমাদের জিনেই রয়েছে অগস্ত্য, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, অষ্টাবক্র মুনিদের বিপুল অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার। আমাদেরই সেই উত্তরাধিকারের দায় ভার বহন করতে হবে।

সামান্য প্রচেষ্টা

সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

বিধ্বংসী করোনার মুখোমুখী গোটা বিশ্ব সন্ত্রস্ত ও লকডাউনের সম্মুখীন। তার ফলে কিছু মানুষ কাজ হারিয়ে, অর্থহীন হয়ে আধপেটা খেয়ে অনাহারের মোকাবিলা করছে, যা করোনার ছোবল অপেক্ষা আরও বেশি ভয়াবহ। সরকারি অনুদান শুরু হলেও বণ্টনে কারচুপি হচ্ছে। আবার অনেকেরই রেশন কার্ড না থাকায় খাবারের অভাবে অভুক্ত থেকে যাচ্ছে। যারা রেশন পাচ্ছে সেটাও আবার নিম্নমানের চাল, যা খাবার পক্ষে ভালো নয়।

ঠিক এই সময় বনগাঁনগরের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং এলাকা খুঁজে বের করা হয়েছে যাদের রেশন কার্ড নেই, তাদের নামের তালিকা করে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে চাল, ডাল, আলু, তরিতরকারি ও সয়াবিন। বিনিময়ে পেয়েছি তাদের মুখের শুকনো হাসি ও আশীর্বাদ।

যদিও-বা এই অনুদান সামান্য তবু করোনার এই মারণ রোগকে উপেক্ষা করে বনগাঁনগরের স্বয়ংসেবকরা এগিয়ে গেছে সাহায্যের জন্য। অতীতে এরকম অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়ের যুদ্ধকালীন অবস্থায় জীবন বিপন্ন করে। স্বয়ংসেবকরা জাতি ধর্মনির্বিশেষে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

ধর্মান্তর প্রতিরোধে আজও প্রভু জগদ্বন্ধুর আদর্শ অনুপম দৃষ্টান্ত

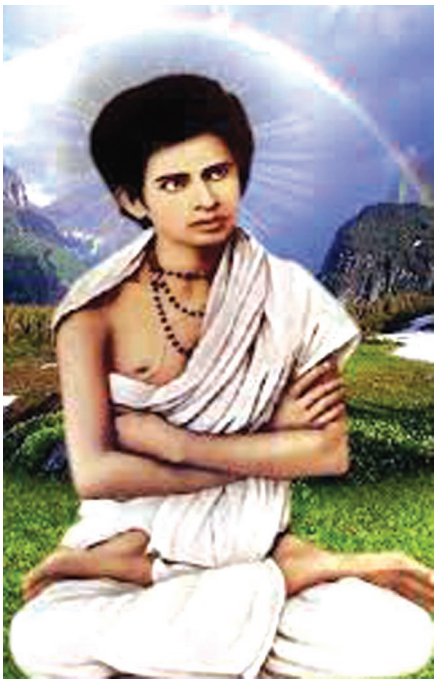

কুশলবরণ চক্রবর্তী

জগদ্বন্ধু সুন্দরের (২৮ এপ্রিল ১৮৭১-১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২১) একটি অনন্য কীর্তি হলো, বাগদি-সহ প্রান্তিক অসহায় মানুষের কাছে পৌঁছে, তাদের মাঝে ভগবদ্‌ভক্তি প্রচার করা। তাঁর সেই প্রচারে ব্রাহ্মণকান্দার রজনী বাগদি শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া ও মোহান্তে পরিণত হয়েছিলেন। জগদ্বন্ধু সুন্দর বলেছিলেন, 'সমাজের বাঁধ ভেঙে দেব।' তিনি সত্যিই সমাজের বাঁধকে ভেঙে দিয়েছিলেন। সনাতন ধর্মে বেদাদি শাস্ত্রে সর্বদাই সাম্যাবস্থার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিপরীতে সমাজে বিভিন্ন সময়ে অসাম্যের বিষফোঁড়া জন্ম নিয়ে সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। সেই ক্ষতবিক্ষতের সুযোগ নিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তরিত করেছে অন্যান্য বহিরাগতরা। তাই অসাম্যের পঙ্কিলতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমাদের আবার নতুন করে বৈদিক সাম্যবাদী চেতনায় উপনীত হতে হবে। মানুষে মানুষে সামাজিক অসাম্য কখনই মঙ্গলকর নয়। সামাজিক অসাম্যের সামান্যতম ছিদ্র দিয়েও বৃহত্তর বিপদের কালসাপ প্রবেশ করে জাতির সর্বোচ্চ ক্ষতি করতে পারে। এর প্রমাণ আমরা বিভিন্ন সময়েই পেয়েছি।

সনাতন ধর্মাবলম্বী সকল মহামানবই মানুষের সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। এর মধ্যে জগদ্বন্ধু সুন্দর এক অনুপম দৃষ্টান্ত। তাঁর আদর্শ ও দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে যদি সাধু-সন্ন্যাসীরা প্রান্তিক মানুষের জীবনে পৌঁছে তাদের দুঃখবেদনার খোঁজ নিতেন, তবে হয়তো ধর্মান্তর শূন্যের পর্যায়ে চলে যেত। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অশেষ কল্যাণ হতো। গোপীবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী রচিত 'শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে বুনো বাগদি রজনী সর্দারের ভক্ত হরিদাসে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনাটি অত্যন্ত সুন্দর করে বর্ণিত হয়েছে। সেই দৃষ্টান্তমূলক কাহিনিটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করছি।

বৃহত্তর ফরিদপুর, ঢাকা, যশোহর শহরে সনাতন ধর্মাবলম্বী বাগদি সম্প্রদায়ের বহু মানুষ বসবাস করত। খ্রিস্টান মিশনারি পাদরিরা তাদের ধর্মান্তরিত করার জন্যে ব্যাপকভাবে প্রচেষ্টা শুরু করে। এই লক্ষ্যে তারা এই গরিব সম্প্রদায়ের মাঝে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্যের নামে ধর্মান্তরিত করার ফাঁদ পাতে। এই বাগদিরা কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডাদের সমগোত্রীয়। ব্রিটিশ শাসনামলে নীলের চাষের জন্যে নীলকুঠিয়ালরা ঝাড়খণ্ডের ও অন্যান্য পার্বত্য দারিদ্রপীড়িত অঞ্চল থেকে তাদের দলে দলে বাঙ্গলায় নিয়ে আসে। নীলকুঠিয়ালরা এই অসহায় দরিদ্র মানুষদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করতো। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি এর একটি সাহিত্যিক নিদর্শন। শত অত্যাচারের মধ্যেও যতদিন নীলের চাষাবাদ সচল ছিল, ততদিন এই অসহায় বাগদিদের কপালে তবু দুটি অন্ন জুটতো। কিন্তু পরবর্তীতে রাসায়নিক উপায়ে নীলের উৎপাদন শুরু হলে, নীলের চাষ প্রায় উঠেই গেল। ফলে অন্যস্থান থেকে বাঙ্গলায় আগত এই অসহায় মানুষগুলো ভয়ংকরভাবে আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেল। তখন তারা ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তারা রাস্তা তৈরির শ্রমিক, ঘর বাঁধা, ইটের সুরকি ভাঙা, শূকর চরানো ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে কোনোমতে খেয়ে পরে বেঁচে থকে। অচেতন হিন্দু সমাজের চোখের আড়ালেই থাকে গরিব অসহায় এই মানুষগুলোর জীবনপ্রবাহ। বন থেকেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করতো বলে এই বাগদিদের অনেকে 'বুনা' বা 'বুনো' বলতো। জগদ্বন্ধু সুন্দরের সময়ে ফরিদপুর শহরের মেলার মাঠের আশেপাশে এই বুনো বাগদি সম্প্রদায়ের কয়েক সহস্র লোক বসবাস করতো। তাদের প্রত্যেকটি এলাকাতেই একজন করে প্রধান থাকতো। সেই প্রধানকে বলা হতো সর্দার। তেমনি ফরিদপুর শহরের মেলার মাঠের বাগদিদের সর্দার ছিলেন রজনী সর্দার। লম্বা লম্বা চুল, লম্বা লম্বা দাড়ি, বড়ো বড়ো গোঁফ, কপালে সিন্দুরের রাঙ্গা ফোঁটা, জবাফুলের মতো রক্তবর্ণ চোখ আর বিশাল আকৃতি ছিল রজনী সর্দারের। লাঠি খেলা, শরকি খেলা, তির-ধনুকের খেলা, সকল বিষয়ে রজনী সর্দার ছিলেন পারদর্শী। গায়ের রং চাঁদহীন রজনীর মতো কালো হলেও রজনীর গুণ অনেক। নর-নারী রজনীর কাছে অনেক প্রকার উপকার পায়। কেবল ফরিদপুর শহরে নয়, সমস্ত জেলায় রজনী সকলের পরিচিত। নানা জনে নানা প্রয়োজনে রজনীকে ডাকে।

এই অসহায় মানুষদের অসহায়ত্বের সুযোগে খ্রিস্টান মিশনারি পাদরিরা প্রতিনিয়ত বুনো বাগদিদের পাড়ায় আসা শুরু করে। বুনাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরিত করার ছক কষতে থাকে। খ্রিস্টান মিশনারিরা চিন্তা করে, রজনী সর্দারকে ধর্মান্তরিত করতে হবে। মিশনারিদের কথায় প্রলুব্ধ হয়ে নিজের সম্প্রদায়কে নিয়ে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে রজনী সর্দার ধর্মান্তরিত হবার সিদ্ধান্ত নেয়। সহস্রাধিক বুনো বাগদি-সহ রজনী সর্দার খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হবে। সেই লক্ষ্যে পাদরিরা আসে। এই অসহায় মানুষগুলোর ধর্মান্তরিত হওয়ার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন। সহস্রাধিক বুনো বাগদি ধর্মান্তরিত হবে, এই সংবাদে ফরিদপুরের তৎকালীন অচেতন হিন্দু সমাজের মাথাদের কাউকেই সামান্যতম বিচলিত হতে দেখা গেল

না। শুধু একজনের হৃদয় কেঁদে উঠল। তিনি হলেন, ফরিদপুর শহরতলির ব্রাহ্মণকান্দার নবীন সাধক প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর। সকালবেলা দুঃখীরাম ঘোষ এসে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরকে বলেন, 'প্রভু, যে রজনী বাগদি সেদিন চৌদ্দমাদল কীর্তনের সময় ছুটে এসেছিল তারা সকলেই খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে।' দুঃখীরাম ঘোষ ফরিদপুরের বাজারে সংবাদটি শুনেছে। নির্মম এই সংবাদটি শুনে তাঁর হৃদয় বেদনার্ত হয়ে উঠে। দুঃখীরামের কথা শুনে, বাগদিদের ধর্মান্তরিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর অস্থির হয়ে যান। তিনি বলেন, 'দুঃখী, তুমি এখনই যাও, আমার নাম করে রজনীকে ডেকে আন।' প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আজ্ঞায় কালবিলম্ব না করে দুঃখীরাম তৎক্ষণাৎ রজনী সর্দারের কাছে ছুটে গেলেন।

দুঃখীরাম দীর্ঘদেহী পুরুষ। দ্রুতগতিতে তিনি চলতে অভ্যস্ত। বিপদে পড়লে মানুষ যেমন বেগে ধাবমান হয়, প্রভু জগদ্বন্ধুর আদেশ মাথায় নিয়ে দুঃখীরামও সেই মতো বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ছুটলেন। কিছু সময়ের মধ্যেই তিন মাইল পথ অতিক্রম করে তিনি বুনো পাড়ায় পৌঁছে গেলেন। রজনীর কুটিরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রজনী, তোমাকে প্রভু ব্রাহ্মণকান্দায় ডেকেছেন।' রজনী সর্দারের চোখে আনন্দাশ্রু বয়ে গেল। তিনি বললেন, 'প্রভু আমাকে ব্রাহ্মণকান্দায় ডেকেছেন!' রজনী সর্দারের মনে পড়ে গেল, আগের দিনের চৌদ্দমাদল মহোৎসবের কথা, সেই মহোৎসবে সে সকল মানুষের সঙ্গে, মানুষের মতো এক পঙ্‌ক্তিতে বসে পরমানন্দে খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। রজনী সর্দার আজও তা ভুলে যাননি। সর্বোপরি কীর্তনের মধ্যে যে জ্যোতির্ময় মানুষটিকে সে দর্শন করেছিল, সেই মানুষটির কথা সে ক্ষণেকের তরেও ভুলে যাননি। মাথার লম্বা লম্বা বাবরি চুলগুলোকে ঠিক করে, কোমরে চাঁদর বেঁধে একখানি গামছা কাঁধে ফেলে, লাঠি হাতে রজনী সর্দার দুঃখীরাম ঘোষের সঙ্গে ব্রাহ্মণকান্দায় এলেন। পথে রজনীকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'রজনী সকালবেলা কোথায় চলেছ?' সকলের প্রশ্নেরই এক উত্তর দিলেন রজনী সর্দার— 'প্রভু ডেকেছেন।' 'প্রভু ডেকেছেন,'— এই গৌরবে রজনী গৌরবান্বিত। তাঁর হৃদয় যেন প্রস্ফুটিত হয়ে অনেকখানি বড়ো হয়ে গিয়াছে। ক্ষুদ্রত্বের বেদনাভার ইতিমধ্যেই অনেকখানি লাঘব হয়েছে। বড়ো বড়ো চোখ দু'টিতে আজও জল ছলছল করছে।

রজনী সর্দার এসেছে শুনে জগদ্বন্ধু সুন্দর অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে 'রজনী এসেছ!' বলতে বলতে ঘর থেকে বাইরে এলেন। জগদ্বন্ধু সুন্দরকে দেখে রজনী প্রণাম করার জন্যে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু প্রণামের আগেই দু'হাত প্রসারিত করে জগদ্বন্ধু সুন্দর রজনীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। রজনী এক দৈব সংস্পর্শ লাভ করলেন। মুক্তপুরুষের আলিঙ্গনে রজনীর দেহমনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। তাঁর বজ্রদেহ ননির মতো ভক্তিতে গলে গেল। কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরে রজনী সর্দার বললেন, 'প্রভু, এ অধমকে ডেকেছেন?' উত্তরে জগদ্বন্ধু সুন্দর বললেন, 'হ্যাঁ, ডেকেছি রজনী, তোমরা নাকি খ্রিস্টান হবে?' জগদ্বন্ধু সুন্দর প্রশ্নের উত্তরে রজনী বললেন, 'হ্যাঁ প্রভু, কাল পাদরিরা আসবে।' জগদ্বন্ধু সুন্দর পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন 'কী কারণে?' রজনী সর্দারের উত্তর, 'আপনি তো সকলই জানেন। আপনাকে আর কী বলব! সমাজে আমাদের তেমন স্থান নেই। অপমান অত্যাচার অর সহ্য হয় না। প্রভু আমরা হীন বুনা জাত। এ সমাজে আমাদের স্থান কোথায়?' বলতে বলতে রজনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। জগদ্বন্ধু সুন্দর বললেন, 'রজনী, কে বলেছে তোমরা হীন? তোমরা হীন নও, তোমরা মহান। হরিনাম করলে তোমরা আরও মহান হবে। তোমরা বুনা জাতি নও। তোমরা মানব জাতি। তোমরা আমার অতি প্রিয়। শ্রীহরির দাস তোমরা, এই তোমাদের প্রকৃত পরিচয়। রজনী, তুমি সেই নিত্যকালের পরিচয়ে পরিচিত হও। সকল দুঃখ ঘুচে যাবে। আজ হতে তুমি আর রজনী নও। তুমি হরিদাস! হরিনাম কর। প্রাণ ভরে নিতাই-গৌরের জয় গাও। সগোষ্ঠী ধন্য হও। আর এখন হতে তোমরা আর বুনা নও। তোমাদের উপাধি হবে মোহান্ত।' রজনী সর্দারকে জগদ্বন্ধু সুন্দর ডাকলেন, 'হরিদাস!' এই ডাকে সদ্য হরিদাস নামক রজনী সর্দারের চোখে অঝোর ধারায় আনন্দাশ্রু বয়ে যেতে লাগল। জগদ্বন্ধু সুন্দর বললেন, 'কাল তুমি সগোষ্ঠী এখানে এসে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রসাদ গ্রহণ করবে। তোমাদের যত লোক আছে, নর-নারী, বালক-বৃদ্ধ সবাইকে নিয়ে আসবে।' —এই কথা বলে জগদ্বন্ধু সুন্দর গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আত্মহারা হরিদাস কিছু সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর কাছে ঘটনাগুলো স্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল। তাঁর মধ্যে সকল সংশয় বিলীন হয়ে গেল। তিনি আজ সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। সমাজ যেহেতু মানুষ তৈরি করে। তাই স্বার্থান্বেষী মানুষের কারণে সমাজে অসাম্য রয়েছে। কিন্তু বেদে সকল মানুষের মাঝেই সাম্যবাদী প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। সকল মানুষের আধ্যাত্মিক-সহ জাগতিক সকল বিষয়ে সমানাধিকার প্রসঙ্গে ঋগ্বেদ সংহিতার শাকল শাখার দশম মণ্ডলের শেষ সূক্তে বলা হয়েছে।

বুনো বাগদিদের 'মোহান্ত' হওয়ার সংবাদটি সর্বত্রই প্রচারিত হয়ে গেল। খ্রিস্টান মিশনারিদের দশ বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা জগদ্বন্ধু সুন্দরের কয়েকটি কথায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হয়ে ভেসে গেল। মিশনারিদের বিদায় দিয়ে হরিদাস (রজনী সর্দার) শত শত বালক-বালিকা, নরনারী সঙ্গে ব্রাহ্মণকান্দায় উপস্থিত হয়ে সংকীর্তন করছে। তাদের জাতি বর্ণের ভেদ ঘুচে গেছে। সকলে সমান আসনে, সমান আদরে, পরম তৃপ্তির সঙ্গে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছে। বুনো বাগদি জাতির নতুন জন্ম হয়েছে। শিক্ষিত মহলে সাড়া পড়ে গেল। সকলেই জগদ্বন্ধু সুন্দরের জাতিরক্ষার প্রশংসা করতে লাগলো। কলকাতায় এই ঘটনা নিয়ে পত্রিকায় লেখা হলো। কিন্তু বিষয়টিতে মিশনারিদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হলো। ইংরেজদের 'আবগারি' নামক পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো।

বুনো বাগদিদের ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে রক্ষা করা; জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মাঝে হরিনাম সংকীর্তনের প্রচার; কলকাতায় সুরুতকুমারী দেবীর মতো অসংখ্য বিপথগামী নারীদের ধর্মপথে ফেরানো; ১৯২০ সালের প্লেগ মহামারী নির্মূলে কলকাতায় মানুষের পাশে থাকা; সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব ইত্যাদি সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ বিদূরিত করা-সহ জাতি-ধর্ম রক্ষায় জগদ্বন্ধু সুন্দরের অবদান অনন্য। তাই তিনি আজও বরণীয় ও পূজনীয়।

তথ্যসূত্র : ১. গোপীবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী।

(লেখক সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)

সেবার মূল প্রেরণা আধ্যাত্মিকতা

সত্য নারায়ণ মজুমদার

অনেকদিন আগের ঘটনা। পরম জ্ঞানী রঘুনাথ পরচুরে শাস্ত্রী ঈশ্বরের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গার তীরবর্তী এক কুটীরে এসে পৌঁছান যেখানে আচার্য সত্যব্রতের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। আচার্য তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে শাস্ত্রীজী বলেন যে তাঁর নাম মহামহোপাধ্যায় মহাপণ্ডিত রঘুনাথ পরচুরে শাস্ত্রী বাচস্পতি বিদ্যাবারিধি। এ কথা শুনেই আচার্য সত্যব্রত হাসতে হাসতে বললেন—বৎস রঘুনাথ! জ্ঞান তো মানুষকে গুরুগম্ভীর করে তোলে, কিন্তু দেখছি তোমার জ্ঞান তোমাকে হালকা ও চটুল করে তুলেছে। আচার্যের ইঙ্গিত ছিল তাঁর উপাধি ও মাথাতে চেপে বসে থাকা অহংকারের প্রতি। শাস্ত্রীজী জিজ্ঞাসা করলেন—'হে আচার্য শ্রেষ্ঠ! পরমাত্মাকে লাভের জন্য কী করব? আচার্য বললেন—সর্বপ্রথম এই ভার নামিয়ে ফেলে, তা পৃথক করে রাখো। যদিও কঠিন কাজ তবুও বলছি এতে কোনো হাত লাগাবে না। এই কাজ করতে পারলে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যে তুমি কি প্রেম শব্দের সাথে পরিচিত আছ? তুমি কি কখনো প্রেমের পথে অগ্রসর হয়েছ? পণ্ডিত রঘুনাথ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে শুনতে থাকলেন। আচার্য বললেন— আমি বলছি পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করো, প্রেমের পথে অগ্রসর হও, মন্দিরকে ভুলে যাও, হৃদয়কে খুঁজতে থাকো, কারণ সেখানেই ঈশ্বর আছেন। প্রথমে তুমি প্রেমের মন্দিরে প্রবেশ করো, প্রেমকে জাগ্রত কর এবং তাকে জানো। তারপর আমার কাছে এসো, তোমাকে পরমাত্মার কাছে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

এই হলো আমাদের পূর্বপুরুষগণের ভারতাত্মা তথা বিশ্বাত্মাকে জানার নিরন্তর সাধনা যার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে ভারত রাষ্ট্র। এক 'ভদ্র ইচ্ছা' যা হলো বিশ্বচরাচরের মঙ্গল কামনা ও তার জন্য নির্ধারিত কাজের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা রচনা করেছেন। সমাজ এক জীবন্ত একক। জীবন সম্পর্কিত এই হিন্দুমান্যতা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি চরাচর —জড় ও সচল এক জীবন্ত তত্ত্বরূপে সমাবিষ্ট হয়েছে। যদিও নিজস্ব বাহ্যরূপ ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এগুলি দৃষ্টিগোচর হয়ে এক ভ্রম উৎপন্ন করে। এই বিষয়টিই জগদীশ চন্দ্র বসু লন্ডনের ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটিতে বৈজ্ঞানিকদের সংক্ষেপে বুঝিয়েছিলেন। উদ্ভিদের মধ্যে সজীব চেতনা যেমন আছে তেমনি ধাতুর মধ্যে ও সমস্ত প্রাণীর সমান সজীব চেতনা বিদ্যমান। এই বিষয় প্রমাণ করে তিনি বলেছিলেন— 'আমাদের রাষ্ট্রের প্রাচীন মহাত্মাগণ হাজার হাজার বছর আগে গঙ্গাতটে সাধনা করার সময় ঘোষণা করেছিলেন যে তিনিই হলেন প্রকৃত জ্ঞানী যিনি সৃষ্টিতে অত্যন্ত বিস্ময়কারী বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেও তার মধ্যে ব্যাপ্ত একতাকে অনুভব করতে পারেন। আমি অত্যন্ত সাধারণ ভাবে পরীক্ষাগারে এই সত্যটিকে প্রদর্শন করলাম।'

সমাজের দুর্বল, শোষিত, বঞ্চিত ব্যক্তিদের দেখে সেবাভাব বা কর্তব্যভাব জাগিয়ে তুলে তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে, আমরা এক বিশাল পরিবারের সকলে সদস্য— এই ভাবনাকে জাগ্রত করে সেবা পরায়ণতা যাতে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাবে পরিণত হয় তার জন্য এক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আজ দেখা দিয়েছে।

একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে প্রত্যেকের মধ্যে সমাহিত অথবা সমাবিষ্ট এবং ঐক্য সৃষ্টিকারী জীবনের এই প্রেরণাশক্তি কোনো সামাজিক মানবসৃষ্ট আইন দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে না। কোনো সরকারি আদেশ দ্বারাও এর প্রয়োগ সম্ভব নয়। এর বিপরীতে এই তত্ত্বকে রক্ষা করার একমাত্র আধার হলো এই সর্বোচ্চ জীবন প্রেরক শক্তিকে জাগ্রত করে তার সংবর্ধন ও সংরক্ষণ করে এবং তখনই অন্য জীবিত প্রাণীর ন্যায় সমাজ ও জীবিত থাকতে সক্ষম হবে এবং সমস্ত ক্ষেত্রে তার বিকাশ সম্ভবপর হবে।

এই সর্বশেষ দিকটিতে বার বার জোর দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এহেন জীবন ব্যাপী প্রেরক শক্তি সমাজের জীবন পদ্ধতিতে কেবলমাত্র আংশিক ভূমিকা পালন করবে এমন প্রত্যাশা করলে হবে না, কারণ হলো যে এই জীবন প্রেরক শক্তি সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ দ্বারা কৃত সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অথবা কাজের নির্দেশক শক্তি। এই শক্তি হলো জীবন্ত শরীরের মতো যার মধ্যে কোটি কোটি জীবন্ত কোষ শক্তি প্রদান করে চলেছে।

সর্বোচ্চ জীবনশক্তি বা আধ্যাত্মিকতার এই হলো মূল সিদ্ধান্ত যা সমাজের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি ও সুন্দরভাবে তাকে পরিচালনা করার শক্তি প্রদান করে এবং যার মাধ্যমে ভিতরের ও বাইরের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে। ফলস্বরূপ এই শক্তি সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠেছে।

পাশ্চাত্য জগতে সুখী সমাজ ব্যবস্থার

জন্য অনেক প্রকার প্রয়োগ হয়েছে কিন্তু সেখানে সর্বোচ্চ জীবন-শক্তি যা আধ্যাত্মিকতা ব্যতীতই মনুষ্যের স্থায়ী আনন্দপূর্বক ও শান্তিময় জীবন লাভের জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে সেখানে ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা বা চার্চের শাসন দিয়ে পরীক্ষা শুরু হয় কিন্তু ধর্মযাজকদের স্বেচ্ছাচারিতা জনজীবনকে এতটাই কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল যে সেই ব্যবস্থাকে সমূলে তুলে ফেলেছিল সেখানকার রাজতন্ত্র। কিন্তু রাজাদের অত্যাচারী বংশানুগত শাসন স্থায়ী হয়নি—স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর ধ্বনি তুলে রক্তাক্ত বিপ্লবের সঙ্গে তার অবসান হয়। তারপর শিল্প বিপ্লবের ফলস্বরূপ অকল্পনীয় আর্থিক শোষণ থেকে সৃষ্ট গণবিক্ষোভ, সাম্যবাদের নামে কোথাও কোথাও সশস্ত্র বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল কিন্তু সেখানেও মানবিক ক্রূরতার সঙ্গে দীর্ঘ সাত দশক সেই শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হলেও তার বিপর্যয় ঘটেছে এবং আজ পুঁজিবাদী মুক্ত বাণিজ্যিক অর্থব্যবস্থা গণতন্ত্রের আবরণে শোষণেরই কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

বিশ্বায়ন, বিশ্বগ্রামের আকর্ষণীয় স্লোগান প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীকে বিশ্ববাজারে পরিণত করে দিয়েছে। মানবতার দিক থেকে এর ভয়ংকর কুফল আজ অনুভূত হচ্ছে। পারিবারিক জীবনে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা, হিংসা, হত্যা, আত্মহত্যা, যৌন-অপরাধ, স্নায়ুরোগ, মানসিক ব্যাধি, মহিলাদের উপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচার, ধনী-নির্ধনের মধ্যে পার্থক্য, উপার্জনহীনতা, মানবজীবনের যন্ত্রীকরণ, পরিবেশ প্রদূষণ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি হলো এর প্রমাণ। সংযুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানব বিকাশ পরিষদ তার প্রতিবেদনে এহেন পরিবর্তনের জন গভীর চিন্তা প্রকাশ করে আক্ষেপ করে বলেছে যে এই সর্বব্যাপী সন্ত্রাসে (মানব) বিশ্বের সর্বাধিক সচ্ছল সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই কারণে সারা বিশ্বের চিন্তকবর্গ অত্যন্ত কঠোরভাবে সাবধান বার্তা প্রদান করছেন যে, মানব কল্যাণ বিষয়ে বর্তমানে যে দৃষ্টিকোণ রয়েছে তার আমূল পরিবর্তন না হলে মানবতার সর্বনাশ সুনিশ্চিতভাবে ঘটবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যে পবিত্র ও আধ্যাত্মিক হওয়া প্রয়োজন সে বিষয়েও তাঁরা বলেছেন যে, এর থেকে সমাধান পেতে পূর্বের দিকে অর্থাৎ প্রাচ্যের দিকে তাঁদের তাকাতে হবে। এই প্রাচ্য অর্থে বিশেষভাবে ভারতকেই বোঝায়।

কিন্তু এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে কেলমাত্র আক্ষরিক অর্থে প্রচার করলেই হবে না, আধ্যাত্মিকতাকে জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে যদি তার প্রয়োগ না করা হয় তবে জীবন শীঘ্রই বিখণ্ডিত হয়ে বিমর্ষ হবে। ভারতীয় বা হিন্দু জীবন দৃষ্টিতে সর্বত্র ঈশ্বর বিদ্যমান এবং ব্যক্তি ও সমষ্টি একই ঈশ্বরের বাহ্য স্বরূপ। ঈশ্বর মঙ্গলময়, সেই কারণে প্রত্যেকে মঙ্গলকর্মই সাধন করবে যার ফলে সমাজে এক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে সকলেই সুখে থাকবে। একে অপরের পরিপূরক, প্রত্যেকে প্রত্যেকের হীনতা, দুর্বলতা দূর করার জন্য ধর্মকে অর্থাৎ কর্তব্যকর্মকে অবলম্বন করবে। অমূর্ত ঈশ্বরের মূর্ত রূপ সমাজ। সুতরাং সমাজের কল্যাণ সাধন করাই হলো মনুষ্যবৃত্তি। মানুষ নারায়ণের স্বরূপ, তাই সমাজসেবাই হলো একমাত্র ধর্ম। সর্বাধিক প্রয়োজনীয় কথা হলো যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সে পুরুষ অথবা নারী হোক, তার জীবনের দৈনিক কাজের জন্য এক নিয়ম বিকশিত করা প্রয়োজন। কিন্তু এই ধরনের জীবনশৈলীর নির্ধারণ ততদিন সার্থক বা ফলদায়ী হবে না যতক্ষণ না সমাজের প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সুখময় জীবন নির্বাহ করার লক্ষ্যে প্রেরিত হয়। বস্তুত মানসিক প্রচেষ্টার এই চরম উপলব্ধির মূল কথা—'আত্মনা মোক্ষার্থ জগদ্ধিতায় চ'-এর মধ্যেই নিহিত আছে। অর্থাৎ মানব জাতির ক্ষেত্রেই ব্যক্তির পরম কল্যাণ নয়, বরং চরাচরের প্রাণী মাত্রেরই হিত, সুখ ও কল্যাণের কামনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্ম ব্যক্তি স্তর থেকে আরম্ভ করে পরিবার থেকে মানবতা এবং সম্পূর্ণ সৃষ্টি তথা সর্বোচ্চ সত্তা ঈশ্বরকে সংযুক্ত করে। এই ঈশ্বর থেকেই বিস্ময়কারী বৈচিত্র্যের সঙ্গে যুক্ত সৃষ্টি বিকশিত হয়েছে। এহেন জীবনশৈলী থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, এর অন্তর্গত কর্তব্য অধিকারের ক্ষেত্রে সেবা ও ত্যাগের ভাবনা, শোষণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সদ্ভাবনা, সংঘর্ষের ক্ষেত্রে শান্তি এবং প্রসন্নতা, দুঃখ ও উদ্বিগ্নতার ক্ষেত্রে স্থান গ্রহণ করে এবং সেবার মাধ্যমে অর্থহীন নিরর্থক ও নৈরাশ্যপূর্ণ জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের সুযোগ এনে দেয়। প্রাণীমাত্রেই ঈশ্বরের সত্তার উপলব্ধি মানুষকে তার জন্য কাজ করার প্রেরণা এনে দেয়। এই প্রেরণা বা প্রেম ভাবনা যখনই মনে সঞ্চারিত হয় তখনই সেই ব্যক্তি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করে তার দুঃখ দূর করার জন্য এবং তাকে স্বাবলম্বী করার জন্য এগিয়ে আসে। এই প্রেম ভাবনা বা আধ্যাত্মিক ভাবনাই সেবা কার্যের মূল প্রেরণা শক্তি।

প্রাচীনকাল থেকেই সেবাভাবযুক্ত সমাজ জীবন ভারতবর্ষে বিকশিত হয়েছিল। সেই কারণে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সেবাভাব বা ধর্মভাব নিয়েই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে আসছিল—মাতৃধর্ম, পিতৃধর্ম, রাজধর্ম, প্রজাধর্ম প্রভৃতি ধর্ম বা কর্তব্যের মাধ্যমে সমাজ জীবন ছিল স্বনির্ভর। কিন্তু তার বিস্মৃতি দীর্ঘকাল পরাধীন থাকার জন্য সমাজে এসেছে। ফলে আজ সমাজ জীবনে বহু রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমাজে অনৈক্য, অসাম্যের ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। দুর্বলরা শোষিত হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সমাজ দুর্বল হয়েছে। কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই ঐক্যের ভাব, সহযোগিতা ও পরিপূরকতার ভাবনা জাগ্রত হয়। সমাজের দুর্বল, শোষিত, বঞ্চিত ব্যক্তিদের দেখে সেবাভাব বা কর্তব্যভাব জাগিয়ে তুলে তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে, আমরা এক বিশাল পরিবারের সকলে সদস্য— এই ভাবনাকে জাগ্রত করে সেবা পরায়ণতা যাতে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাবে পরিণত হয় তার জন্য এক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আজ দেখা দিয়েছে। এই ভাবনার ব্যাপক জাগরণেই আমরা আবার আমাদের রাষ্ট্রকে বিশ্বগুরুর আসনে বসাতে পারবো এবং 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর আদর্শ-বচনকে সার্থক করে তুলতে সক্ষম হব। □

সেবা-সাধনায় ভারতীয় নারী

বিজয় আঢ্য

দঃ ২৪ পরগনায় আর্ত মানুষের পাশে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি।

মানব মনের এক মহতী প্রবণতার নাম সেবা। কর্মের আড়ম্বরের পরিমাপের মাধ্যমে কিন্তু সেই ভাবটির প্রমাণ বা পরিমাপ হয় না, হয় কেবল অন্তরের প্রবৃত্তিতেই। সামান্য পরিমাণ ঠিক ঠিক ভাবে করা হলে সেব্য ও সেবক উভয়েই দিব্যানন্দের অধিকারী হন। আর অন্তরের তাগিদ ছাড়া সেবা হাজার উপযোগী হলেও আদতে ক্ষণস্থায়ী, স্বল্প ফলদায়ী কাজ মাত্র। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অহংকারের চাষ ছাড়া কিছু নয়। যা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে কলুষিত করে এবং যাবতীয় বন্ধনের কারণ হয়ে ওঠে। মানুষের সেবার ভাব হলো সনাতন ও বহু আদৃত। কিন্তু নিঃস্বার্থ মানব সেবা মহত্তর, ব্যাপকতর। বস্তুত এটাই হলো—'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

সেবা প্রসঙ্গে অবশ্য একটা কথা স্বীকার্য। সেবা করা স্ত্রী-জাতির সহজাত ধর্ম। তবে এই সেবা শুধু নিজের পরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন সেবার ক্ষেত্র কিন্তু বিশাল ও ব্যাপক। মনে রাখতে হবে, নিষ্ঠা ও ত্যাগ ছাড়া অর্থাৎ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' ছাড়া সেবাধর্ম পালন করা অসম্ভব। তাই নিঃস্বার্থভাবে সেবার মাধ্যমেই দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন সম্ভব।

নারী ও পুরুষ নিয়েই সৃষ্টি। বলা হয়, নারী পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ। ভারতীয় দৃষ্টিতে এই সত্য সুপ্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। 'অর্ধনারীশ্বর' ভাবনাই তার দৃষ্টান্ত। শক্তি শিবের চিরসঙ্গিনী। তাই 'আদ্যাশক্তি'-ই মাতৃভাবনার চরমতম প্রকাশ। ভারতে যখন আমরা আদর্শ নারীর কথা ভাবি তখন একমাত্র মাতৃভাবের কথাই মনে আসে—মাতৃত্বেই তার আরম্ভ এবং মাতৃত্বেই তার শেষ। নারী শব্দ উচ্চারণেই হিন্দুর মনে মাতৃ ভাবের উদয় হয়। কবির কথায়—'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান / চোখে আসে জল ভরে।' ভয় পেয়ে বাবাকে ডাকলেও ব্যথা পেলে মা-কেই ডাকি। অন্য দিকে পাশ্চাত্যের নারী স্ত্রী-শক্তি। পাশ্চাত্যে স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী। পাশ্চাত্যে পরিবারে মা এলে তাকে স্ত্রীর অধীনে থাকতে হয়, কারণ স্ত্রী-ই সেই পরিবারের সর্বেসর্বা।

ব্যক্তির জীবনে, পরিবারের জীবনে, সমাজের জীবনে নারীর ভূমিকা বহুমাত্রিক। এটি তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও ব্যবহারিক জীবনে তার প্রকাশ দুর্লভ। জননী-জায়া-ভগ্নী-কন্যা এইসব পারিবারিক ভূমিকায় নারী প্রধানত নেপথ্যের অধিবাসিনী বাইরের আঙিনায় তাদের স্মরণ, স্বীকৃতি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আর নয় বলেই সংসদে ৩৩ শতাংশ নারীর প্রতিনিধিত্বের কথা ভাবতে হয়। তবুও স্বল্পসংখ্যক হলেও নারী নানাক্ষেত্রে নিজ কৃতিত্বে, নিজ উপলব্ধিতে স্মরণযোগ্য হয়ে রয়েছেন এবং যত দিন যাচ্ছে, ততই তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্যের সাক্ষ্য রেখে চলেছেন। মাতৃত্বে তো বটেই, কৃতিত্বে ও নেতৃত্বেও বিশ্বে, বিশেষত ভারতে তাদের অগ্রগতি ক্রমবর্ধমান।

মাতৃশক্তি কত ভাবে যে সেবার কাজ করে চলেছে সম্প্রতি তারই একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অষ্টম শ্রেণী পাশ বাবা ও মাধ্যমিক পাশ মায়ের একমাত্র সন্তান সৌরদীপ সামন্ত 'নিট' অর্থাৎ সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৫ লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮৭৩৫ র‍্যাঙ্ক করেছেন। ডাক্তারি পড়ে ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করতে চান সৌরদীপ। এত ভালো ফলের পুরো কৃতিত্ব মা রীতাদেবীকে দিয়ে দিচ্ছেন এই তরুণ। বলেছেন, ''মা আমার পড়াশোনার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। মাধ্যমিক পর্যন্ত আমাকে সাইকেলে তিন কিলোমিটার দূরের স্কুলে পৌঁছে দিতেন, আবার নিয়ে আসতেন। রাত জেগে যখন নিটের পড়া পড়ছি, পাশে ঠায় বসে থাকতেন মা। দিনে ১২ ঘণ্টা পড়লে মা পাশে থাকতেন ১০ ঘণ্টা।'' (আনন্দবাজার - ১৮.১০.২০)

উনিশ শতকের শেষ দশকে পৌঁছে স্বামীজী বলেছেন— 'হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।'' কিন্তু কেন? সীতা—সাক্ষাৎ পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ। সাবিত্রী সাহসের প্রতীক কারণ তিনি মৃত্যুদেবতার মুখোমুখি হয়েও মৃত্যুকে জয় করেছিলেন আর দময়ন্তী মানবতার প্রতীক—তাঁর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করে এক মানুষকে তিনি বরণ করেছিলেন।

বিদেশে স্বামীজীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। বাস্তবেই এমন সব 'মিথ' বা কাল্পনিক চরিত্রদের নিয়ে আপনি আলোচনা করেন কেন? স্বামীজীর দৃপ্ত উত্তর ছিল যদি ধরেই নেওয়া যায় যে চরিত্রগুলি 'মিথ' তবুও যে জাতি (হিন্দু) এই রকম চরিত্র কল্পনা করতে পারে, সেই জাতি কত মহান একবার ভাবুন। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে, বিশেষত নারীদের জন্য আমাদের এইসব প্রাচীনা

শিলিগুড়িতে সেবিকা সমিতি।

জননারীরা আজও প্রেরণার উৎস, পথ প্রদর্শক।

আমাদের দেশের নারীরা তাঁদের জীবনের প্রতিটি কর্মের সঙ্গেই ধর্মকে অর্থাৎ মূল্যবোধগুলিকে একীভূত করে নিয়েছেন। যেহেতু যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দেশবিভাগ এবং সরকারি নীতির পরিবর্তন ইত্যাদির জন্য পুরাতন নিরাপত্তাবোধটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সেই জন্য তারাও পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদেরও নতুন মূল্যবোধ ও পরিবেশে মানিয়ে চলতে চাইছেন। এই জন্যই দেখা দিয়েছে একটা সংশয় ও অনিশ্চয়তার ভার, হয়তো কিছুটা মর্যাদার হানিও হয়েছে, তবুও বলতে হবে—'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।'

পুরুষের ন্যায় অধিকাংশ নারীই বিবাহিত ও মাতৃত্বপূর্ণ জীবনই পছন্দ করেন। তাঁরাই হলেন আমাদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। আত্মত্যাগের অপরিসীম শক্তির বলে তাঁরাই হলেন তর্কাতীতভাবে অহিংসার ব্রতে নেত্রী। যুদ্ধরত বিশ্বকে তাঁরাই ভবিষ্যতে শান্তির পথ দেখাবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক লীলাসঙ্গিনী শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর স্বামীর সন্নিধানে তের বৎসরের সাধনা দ্বারা আধ্যাত্মিক অনুভবের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করেছিলেন। একটি সরল গ্রাম্য বালিকা থেকে তিনি এতই উচ্চ আধ্যাত্মিকতার অধিকারিণী হয়েছিলেন যে, ঠাকুরের তিরোধানের পর তিনিই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-আন্দোলনের অদৃশ্য পরিচালিকা শক্তি। প্রায় চৌত্রিশ বছর ধরে হাজার হাজার অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু মানুষদের আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ ''তাঁর জীবন হচ্ছে প্রার্থনার এক দীর্ঘ নীরবতা।.....হীন আচরণে যদি কেউ তাঁকে পীড়িত করত তাহলে তখন তিনি কোনও প্রকার নির্বোধ ভাবালুতায় বিভ্রান্ত হতেন না। যে ব্রহ্মচারীকে আগেই কয়েক বছরের জন্য মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে তপস্যা করার শাস্তি দিয়েছেন, তাঁকে সেই দণ্ডে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন।..... তথাপি তাঁর সত্তাই ছিল কোমলতা ও সরলতাময় লীলা। আর যে কক্ষে তিনি পূজা করতেন, তার সমস্তটাই ছিল মাধুর্যে পরিপূর্ণ।''

ভগিনী নিবেদিতা 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থে আর একজন মহীয়সী নারীর উল্লেখ করেছেন, যিনি ''কৈবর্তকুলোদ্ভবা ধনাঢ্য রানী রাসমণি। তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেন।... লৌকিকভাবে বলিতে গেলে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় হইত না, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠা হইত না এবং বিবেকানন্দ ব্যতীত পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার হইত না।'

যে সময়ে মেয়েদের গতিবিধি অন্তঃপুরের ঘেরাটোপের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মেয়েরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সর্বক্ষেত্রেই তাঁদের প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫)। ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারি ও নিজস্ব স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। মা স্বর্ণময়ীর মধ্যে যে জাতীয়তাবোধের সত্তা ও দেশপ্রেমের উন্মেষ দেখা গিয়েছিল সরলার মধ্যে তা পূর্ণতা পায়। 'ভারতী' পত্রিকা মারফত বাঙালি যুবকদের বীর্যমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন। বীরধর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যায়ামাগার, লাঠি ও ছোরা খেলার আখড়া প্রতিষ্ঠা, কলকাতায় প্রতাপাদিত্য উৎসব, শক্তির আরাধনায় বীরাষ্টমী ব্রত উৎসবের সূচনা তিনিই করেন এবং স্কুল-কলেজের ছেলে আর বয়স্কদের নিয়ে এক অন্তরঙ্গ দল গঠন করেন। ভারতের নানাচিত্রকে প্রণাম করে সদস্যদের দেশসেবার শপথ নিতে হতো। পরে সরলাদেবী সকলের হাতে লাল সুতোর রাখি পরিয়ে দিতেন আত্মনিবেদনের সাক্ষী হিসাবে। অনেক বছর পর এই লাল সুতোর বন্ধন আজ সারা দেশে রাখিবন্ধন উৎসব হিসেবে পরিচিত। স্বদেশি দ্রব্য সাধারণের মধ্যে চালু করার জন্য তিনি নিজে স্বদেশিদ্রব্য ব্যবহার শুরু করেন। 'ভারতী'-র মলাটে দিলেন দেশি রঙের তুলোট কাগজ। বৌবাজারে খুললেন স্বদেশি স্টোর্স। 'জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেত্রীরূপে বঙ্গভাষীদের মধ্যে তিনি এক অতি স্মরণীয় চরিত্র।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রামে যেসব মেয়েরা প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২) ও কল্পনা দত্ত উল্লেখযোগ্য। ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর অধিনায়ক সূর্যসেন (মাস্টারদা) প্রীতিলতার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা করেছেন। রাত প্রায় দশটা। নৃত্য-গীত মুখরিত ক্লাব সাহেব-মেমদের উৎসব-আনন্দে মত্ত। পূর্ব পরিকল্পনা মতো ক্লাবের পেছন দিয়ে পুরুষের পোশাক পরা প্রীতি ও তাঁর সহযোগীরা ঢুকে পড়ল। ইতিমধ্যে যথাস্থানে রাখা টাইমবোমা ফেটে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। প্রীতিলতার নির্দেশে সব বিপ্লবীই রিভলবার চালাতে লাগল। ক্লাব ঘরে হতাহত হল বহু ইউরোপীয়। প্রীতি

প্রত্যন্ত গ্রামে সেবিকা সমিতি।

তার হাতের আগ্নেয়াস্ত্র অন্যের হাতে দিয়ে বিজয়ীর জয়মাল্য পরে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মাতৃভূমির মুক্তিযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিলেন। তার মৃতদেহ তল্লাশি করে পাওয়া গেল শ্রীকৃষ্ণের একখানি ছবি, বীরগতিপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের একটি ফটো, ইউরোপীয় ক্লাবের প্ল্যান, রিভলবার কার্তুজ, আর স্বহস্তে লিখিত একটি স্টেটমেন্ট। মা-কে লেখা একটি চিঠি—"আমি স্বদেশ জননীর চোখের জল মোছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর নেতৃত্ব প্রদানকারী ভারতীয় নারীদের মধ্যে কেরলের (ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য) এই রানি গৌরী পাবর্তীবাঈ (১৮০২-১৮৫৩) ও গৌরী লক্ষ্মীবাঈ (১৭৯১-১৮৪১), ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ (১৮৩৫-১৮৫৮) মহীশূর রাজ্যের (কর্ণটক) রাজা দশম চামরাজ ওয়াডেয়ার-এর বিধবা মহারানি কেম্পজম্মান্নি (১৮৬৬-১৯৩৫)-র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। রানি পার্বতীবাঈ বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে পর্যন্ত না জনগণ সাক্ষর হয় সে পর্যন্ত কোনো সমাজ সংস্কারই সম্ভবপর নয়। তিনিই সম্ভবত ভারতবর্ষের শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই শিক্ষার জন্য রাজস্বের একটি বিশেষ অংশ ব্যয় করতেন, যার ফলে রাজ্যের সকলের কাছেই শিক্ষার ফল পৌঁছেছিল। আজ যদি ভারতবর্ষের শিক্ষার অগ্রসরতার ক্ষেত্রে কেরল (ত্রিবাঙ্কুর) সর্বপ্রথম হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য কৃতিত্ব হচ্ছে রানি পাবর্তীর। এই যুগের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই বীরব্রতী হলেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ। তিনি তেজোদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—'আমি আমার ঝাঁসিকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না।" এই সংকল্পকে ভিত্তি করে তিনি আপোশহীন সংগ্রাম করে গেছেন। এই শতাব্দীর সমাজসেবিকা হিসাবে পণ্ডিতা রমাবাঈ (১৮৫৮-১৯২২), সরোজিনী নাইডু-র নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও একুশ শতকের প্রথম পাদে বিশ্ব তথা ভারতের পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বাস্তবিকই দুনিয়া আজ হাতের মুঠোয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতীয় নারীরা আজ অনেক বেশি সচেতন, প্রথাগত শিক্ষায় অনেকটাই এগিয়ে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও আগের তুলনায় স্বাবলম্বী। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের পদচারণা। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা সেবা কাজ করে চলেছেন। মা সারদার জন্মশতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত সারদামঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন নারীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের পাশাপাশি শিক্ষাবিস্তারের কাজ অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে করে চলেছে। কেরলের অমৃতময়ী দেবী (আম্মা) আধ্যাত্মিক শিক্ষাচর্চার পাশাপাশি নানা ধরনের সেবামূলক কাজ করে চলেছে। অমৃতা বিশ্ববিদ্যাপীঠম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল নাম। নারীদের আত্মরক্ষার জন্য গঠিত দুর্গাবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা সাধ্বী ঋতম্ভরা বর্তমান ভারতে বহু চর্চিত একটি নাম। হিন্দু জাতীয়তার এক তাত্ত্বিক হিসাবে তিনি সুপরিচিত। অনাথ শিশুদের জন্য বৃন্দাবনে বাৎসল্য গ্রাম সেবাকাজের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আর প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী এক আধ্যাত্মিক আন্দোলন— নারীরাই যার পুরোধা। বর্তমান ভারতে সেবা কাজে আত্ম নিবেদিত বহু নারী ও তাঁদের পরিচালিত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান নিরন্তর বিবিধ সেবা কাজে ব্যস্ত। সেবা-সাধনায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ ভারতের মহীয়সী নারীরা আমাদের প্রণম্য।

তথ্যসূত্র ঃ

১। ভারতীয় নারী — স্বামী বিবেকানন্দ (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা)

২। নারী জাগরণের পথ—স্বামী বিবেকানন্দ (ওই)

৩। মহীয়সী ভারতীয় নারী---শ্রীমা জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ (ওই)

৪। বরণীয়াদের পদপ্রান্তে --- সেবিকা প্রকাশন

৫। কর্মযোগিনী বন্দনীয়া মৌসীজী--- সেবিকা প্রকাশন, কলকাতা–৬৪

৬। India Womanhood Through The Ages–Vivekananda Kendra Patrika (Vol. IV. No. 2 August, 1975)

আত্মীয়তাই হীনমন্যতা দূর করার পাথেয়

শ্রী সুদর্শনজী

সঙ্ঘের সেবাকাজ শুরু হয় দিল্লিতে, ১৯৭৮ সালে। সেই সময় থেকেই এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সব খবরই আমি রাখতাম। রবিদাসপুরী নামে এক সেবাবস্তি যেখানে হরিজনরা বসবাস করতেন সেখানে আমাদের কার্যকর্তাগণ সেবা কাজের জন্য গিয়েছিলেন। ওই বস্তিটিকে ভাঙ্গি বস্তিও বলা হতো। আমাদের কার্যকর্তাগণ ওই স্থানে সেবা কাজের জন্য পৌঁছানমাত্র চারিদিক থেকে প্রবল বিরোধিতা শুরু হলো। বলা হলো আমাদের কার্যকর্তারা সব জনসঙ্ঘের লোক। এই বিরোধিতাকে প্রশমিত করতে আমাদের কার্যকর্তারা বললেন, এটা ঠিক আমরা জনসঙ্ঘের লোক। কিন্তু এখানকার বিষয়টি জনসঙ্ঘের বিষয় নয়। এখানে আমরা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে এসেছি। অবশেষে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একটি সংস্কার কেন্দ্র চালু করা হলো। প্রথমে শুরু করা হলো গল্প বলা। বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের সমীক্ষা করে আগেই জানা গিয়েছিল যে তারা নিজেদের ইচ্ছামতো খেলাধুলা করে স্কুলের সময় অতিবাহিত করত এবং বিদ্যালয়েও কেউ তাদের দিকে কোনোরকম লক্ষ্য রাখতেন না। ফলে ওদের মধ্যে অনেকেই বদ অভ্যাসের শিকার হয়ে গিয়েছিল। এখন আমাদের সংস্কার কেন্দ্র থেকে গল্প বলার মাধ্যমে এই ছেলে-মেয়েদের নিজ নিজ পিতা-মাতার চরণ স্পর্শ করা, আদেশ পালন করা, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকা—এইসব শেখান হলো। অল্প দিনের মধ্যেই এর ফল মিলল। একদিন এক কার্যকর্তা যখন বস্তির ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এক মহিলা তাকে ডাকলেন এবং পাশে থাকা আর এক মহিলার সাথে কার্যকর্তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লেন 'জানো, এই মাস্টারমশাই যেদিন থেকে আমাদের বস্তির বাচ্চাদের গল্প শোনাতে আরম্ভ করেছেন সেদিন থেকে এখানকার শিশুদের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ওরা রোজ সকালে বাবা-মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। কখনও শুনেছ হরিজন বস্তির ছেলেমেয়েরা বাবা-মাকে প্রণাম করে?"

আমাদের কার্যকর্তারা এই সব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের এবার পড়ানো শুরু করলেন। পরিণামে ওই বছর বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় ছেলেরা খুব ভালো নম্বর পেয়ে গেল। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তারা বাচ্চাদের ধমক দিলেন এবং বল্লেন 'নকল করেছ নিশ্চয়ই'। ওই ছেলেরা বিদ্যালয় থেকে ফিরে আমাদের কার্যকর্তাদের সামনে কীভাবে তাদের বিদ্যালয় শিক্ষকেরা ভালো ফল করা সত্ত্বেও ধমক দিয়েছে তার বিবরণ রাখল। এই সব শুনে আমাদের কার্যকর্তারা বিদ্যালয় শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করে জানালেন যে তারা ওই সব ছেলে-মেয়েকে পড়িয়েছেন। সে কথা শুনে বিদ্যালয় শিক্ষকেরা অবাক বিস্ময়ে বললেন "আমরা তিন বছর পড়িয়েও যা করতে পারিনি, তা আপনারা তিনমাসে কী করে করলেন?" বিনয়ের সাথে আমাদের কার্যকর্তারা উত্তরে জানালেন 'আপনাদের পড়ানো আর আমাদের পড়ানোর তফাত এই যে আমরা ওদের নিজেদের আত্মীয় মনে করে পড়াই, আর আপনারা ওদের বোঝা মনে করে পড়ান'।

যেখানে সেবার প্রশ্ন সেখানে যদি আত্মীয়ভাব না থাকে, তবে সেবা হতে পারে না। ত্যাগ, সেবা, প্রেম— এ সব নিজের বলে ভাবলে তবেই আসে। যখন আমরা ওদের নিজের বলে ভাবি তখন ওদের সুখ আমাদের সুখ, ওদের দুঃখ আমাদের দুঃখ বলে মনে হয়। এই ছেলেদের যদি আমরা নিজেদের ভাবি তাহলে অন্য কিছুর আর দরকার পড়ে না। আপন অন্তঃকরণেই আসবে প্রেরণা আর তা থেকেই জন্ম নেবে 'আমাদের নিজেদের লোকেদের জন্য কিছু করতে হবে'—এই ভাবনা।

প্রথম থেকেই সঙ্ঘ সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের সংগঠনের জন্য চেষ্টা করে চলেছে। বাস্তবপক্ষে সমাজের সব থেকে দুর্বল শ্রেণীর শক্তিই সমাজের আসল শক্তি। একটি কথা আছে যে শৃঙ্খলের আসল শক্তি হল শৃঙ্খলের দুর্বলতম অংশ। কারণ কোনও শৃঙ্খলকে জোরে টান দিলে তার দুর্বলতম অংশই আগে ছিঁড়ে যায়। সমাজও অনুরূপ। যেহেতু সমাজের দুর্বলতম শ্রেণী সমাজের আসল শক্তি, তাই সমাজের উপর কোনও আঘাত এলে তা প্রথম আসে এই দুর্বলতম শ্রেণীর উপরই। বাস্তবে আজ আমাদের এই দুর্বলতম শ্রেণীর উপরই এসেছে খ্রিস্টানিটি ও ইসলামের আঘাত, লালসা আর লোভ দেখিয়ে ওদের আপন ধর্মাচরণ থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এক মুসলমান সমগ্র পৃথিবীকে ইসলামে এবং এক খ্রিস্টান সমগ্র পৃথিবীকে খ্রিস্টান বানাতে চায়। এইটিই ওদের প্রকৃত চরিত্র।

কিছুদিন আগে দিল্লিতে একটি ঘটনা ঘটেছিল। বছর তিরিশের তথাকথিত অনুসূচিত জাতির এক যুবক বাহান্ন বছরের এক মুসলমান মহিলাকে বিবাহ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হলো 'তুমি কী কারণে এক নওজোয়ানকে বিবাহ করলে?' উত্তরে ওই মহিলা জানাল যে একজন মৌলবি তাকে জানিয়েছে--- একজনকেও সে যদি মুসলমান করতে পারে তবে তার স্বর্গলাভ অবশ্যম্ভাবী। তাই সে ওই নওজোয়ানকে বিবাহ করেছে কেবল তাকে মুসলমান বানাবার জন্য। এই সব কথা জানাজানি হবার পর অবশ্য ওই যুবককে আবার হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

তাই সমাজের কোনও অংশকেই দূর্বল করে রাখা চলবে না। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের কাছে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হতেই তারা সমাজের দূর্বলতম অংশের মানুষজনের কাছে যাতায়াত শুরু করল। তারা দেখলেন ওদের প্রতিভা আছে কিন্তু সুযোগ নেই। তাই তারা বিকশিত হতে পারছে না।

একবার নাগপুরে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সেবিকারা মকর সংক্রান্তির দিন সেবা বস্তিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন। বস্তিতে যাবার পর ওই মহিলারা অন্যান্য মহিলদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং একজন মহিলা তাঁদের জানালেন যে সঙ্ঘ খুব ভালো। কারণ সঙ্ঘে যাওয়ার পর থেকেই তাঁদের ছেলেদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে সে তার বাবাকে রোজ মার দিত, এখন সপ্তাহে মাত্র একদিন মারে। এই সামান্য পরিবর্তনই ওদের কাছে কত বড়ো বলে মনে হয়েছে।

আমেদাবাদেও একটি ঘটনা ঘটেছিল। ওখানকার অনুসূচিত জাতির এক স্বয়ংসেবক তার বোনের বিবাহের সময় সঙ্ঘের কার্যর্তাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। শহরের ২০/২৫ জন উচ্চবর্ণের সভ্রান্ত কার্যকর্তা ওই বিবাহে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাই দেখে ওই স্বয়ংসেবক ও তার পরিবারের লোকজন এদের কোথায় বসাবেন, খেতে বলবেন কী না— এই সব কথা ভেবে খুব সংকোচ বোধ করল। ইতিমধ্যে শহর থেকে যাওয়া কার্যকর্তারা বাড়ির লোকজনদের বল্লেন, 'ভাই, পঙ্‌ক্তি ভোজন কখন শুরু হবে? আমাদের তো আবার অনেক দূর যেতে হবে'। এ কথা শুনে ওই পরিবারের লোকজনদের খুব আনন্দ হলো। ভোজন শুরু হলো আর ভোজনের পূর্বে ভোজনমন্ত্রও উচ্চারিত হলো। ফলে ওই পরিবারের লোকজন এত উৎসাহিত হলো যে হরিজন পরিবারের এই বিবাহেও মন্ত্র উচ্চারিত হলো। সাধারণত এই সব পরিবারের বিবাহে যা কখনও হয় না। একেবারে সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে বিবাহ। চারদিন পর ওই স্বয়ংসেবকের পিতা আমাদের কার্যালয়ে এসে বল্লেন, 'আমার পরিবারের বিবাহে আপনারা কী এমন মন্ত্র উচ্চারণ করলেন যে আমাদের অনেক খরচ বেঁচে গেল? কারণ ওই মন্ত্রপাঠের পর বিবাহের আগে আমরা বাড়িতে পাড়াপ্রতিবেশীরা আর কেউ মদ খেতে চায়নি'।

ভেবে দেখুন, আমাদের সমাজ কোন অবস্থায় আছে। এখানে এতটুকু পরিবর্তন হলে কেমন ভালো লাগে। এই পরিবর্তন আসতেই পারে যদি আমরা একটু আত্মীয়ভাবনা নিয়ে ওদের কাছে যাই। সবচেয়ে প্রথম যে কাজটি করা দরকার সেটি হলো ওইসব হরিজন বস্তির মানুষের মন থেকে হীনমন্যতার ভাব দূর করা। আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। আমরা সমাজের সব চেয়ে নিকৃষ্ট অংশ, আমাদের কেউ চায় না, আমরা কিছুই করতে পারি না—ওদের মন থেকে এই সব ভাবনা দূর করতে হবে। হীনমন্যতার ভাব দূর করার পর জাগানো চাই আত্মসম্মানবোধ। যে হরিজন সমাজকে আজ সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য করা হয় তারা আসলে ছিলেন সব ক্ষত্রিয়। মোগলদের সাথে যুদ্ধে ওরা পরাজিত হয়। ফলে ওদের কাছে মুসলমান হওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়। কিন্তু ওরা রাজি হয়নি। শাস্তি হিসাবে ওদের ময়লা ফেলা বা ঝাড়ুদারের কাজে বলপূর্বক বহাল করা হলো। দেখুন, ওদের ধর্মভক্তি কেমন প্রবল ছিল। ওরা ধর্মের জন্য নোংরা পরিষ্কার করতেও রাজি, কিন্তু র্ধমত্যাগ করতে রাজি নয়। সমাজের অন্যান্য অংশের তুলনায় ওদের এই প্রবল ধর্মভক্তি ছিল এবং আজও ওরা সেই ভক্তিতে অটল। তাই স্বাভাবিক কারণেই ওরা আমাদের আদর ও সম্মানের পাত্র। মহাত্মা গান্ধী এই সব কথা জেনেছিলেন এবং তিনি এর ফলে এতই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি ভাঙ্গি বস্তিতে গিয়ে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

সেবা ভারতীর মাধ্যমে আমরা এইরকম পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছি। কারণ সেবা ভারতীর কার্যকর্তাদের মধ্যে কেবলমাত্র সেবা ভাবই রয়েছে। পিছিয়ে পড়া সমাজের লোকজন আমাদের আপনজন এবং এদের অযোগ্যতাকে দূর করে আমাদের সমকক্ষ করে তুলতে হবে—এই আত্মীয়তার ভাবনা নিয়ে আমরা যেখানে যেখানে যাব আর যা কিছু করব, সব কিছুতেই সফলতা আসবে। প্রত্যেক সেবাবস্তিতেই এই ধরনের কাজ শুরু করা হোক এবং সেখান থেকেই কার্যকর্তা নির্মাণ করা হোক। এইভাবে যদি আমরা কাজ করি তাহলে সমাজে এমন কোনও শ্রেণী থাকবে না যাদের শক্তি কম বলে বিবেচিত হবে। আজ যে দুর্বল আছে কাল যদি সে সবল হয়ে যায় তবে সম্পূর্ণ সমাজই হয়ে যাবে বলবান। আসুন, সকলে মিলে এই আত্মীয়তার ভাবনা নিয়ে কাজ শুরু করি।

(লেখক সঙ্ঘের চতুর্থ সরসঙ্ঘচালক)

ভাষান্তর ঃ অমল বসু

গ্রাম বিকাশ—কল্পনা নয়, বাস্তব

সুহাস রাও হিরেমঠ

ভারত গ্রামপ্রধান দেশ। বিশ্বের মধ্যে প্রাচীনতম দেশ ভারতে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির উত্থান গ্রাম থেকেই হয়েছে। অনেক বিদেশি ইতিহাসকার ও পর্যটক ভারতের সমাজ জীবনের গৌরবময় বর্ণনা করতে গিয়ে সাধারণ গ্রাম্য জীবনকেই তুলে ধরেছেন। হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা পরস্পর সহযোগী, পরোপকারী, বন্ধুত্বপূর্ণ, স্বাবলম্বী, সুখসমৃদ্ধযুক্ত সমাজ জীবন গ্রামের লোকেরাই তৈরি করেছে। এই দেশে অনেক রাজা মহারাজা ছিলেন। মোগল আক্রমণের সময়ও

ফাইল চিত্র

শাসক বদলেছে কিন্তু সমাজ কখনও শাসক নির্ভর হয়নি। এই জন্যই গ্রামের সংগঠিত সুসংস্কৃত লোকেরা বিদেশি আক্রমণের সময় স্বদেশি রাজা ও পরাক্রমী বিপ্লবীদের সাহায্য করেছে ও দেশকে স্বাধীন, সার্বভৌম রক্ষার্থে যোগদান করেছে। শ্রেষ্ঠ সাধুসন্ত, মহান মনীষীগণ, পরাক্রমী সরদার, কলা সংস্কৃতি উপাসক এই সমস্ত গ্রাম থেকেই উঠে এসেছেন। এই স্বাবলম্বী, সুসংহত গ্রামগুলিকে পরমুখাপেক্ষী ও সরকার নির্ভর করার জন্য ইংরেজরা অনেক চেষ্টা করেছে। স্বাধীনতার পর এই দেশের শাসকবর্গও চেষ্টা করেছে। বিকাশের ভ্রান্ত মানসিকতার জন্য আমাদের প্রাচীন শ্রেষ্ঠ পরম্পরাতে আঘাত এসেছে। গ্রামকেন্দ্রিক বিকাশের বদলে শহরকেন্দ্রিক বিকাশের রাস্তা ধরার কারণে গ্রাম থেকে পলায়ন, রাসায়নিক সার ব্যবহার করে সংকটযুক্ত কৃষির মত সমস্যা উৎপন্ন হচ্ছে। এজন্য এখন আমাদের প্রয়োজন— প্রাচীন অনুভূতিপূর্ণ, স্বাবলম্বী, সম্পূর্ণ গ্রাম বিকাশের বাস্তব রূপ দেওয়ার মতো যুগপোযোগী গ্রামীণ পুনর্রচনা।

খুবই আনন্দের কথা, এই লক্ষ্যে আজ সঙ্ঘের অনেক স্বয়ংসেবক সফলভাবে কাজ করছেন। স্বয়ংসেবক ছাড়াও অনেক সাধু মহাত্মা, ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্থা ও জাগ্রত যুবশক্তিও করছেন। গ্রাম পরিবার যোজনা থেকে শুরু করে শহুরে জীবনে দৃশ্যমান বিকৃতিগুলোকে দূর করে দেশের প্রায় সমস্ত রাজ্যে সমগ্রগ্রাম বিকাশের প্রয়াস শুরু হয়েছে। ১৯৯৫ সালে তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক রজ্জু ভাইয়ার উপস্থিতিতে কর্ণাটক প্রান্তের ম্যাঙ্গালোরে এক বিশাল কার্যক্রম হয়েছিল। সেই কার্যক্রমে ২৩ জন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে মঞ্চে সম্মানিত করা হয়েছিল—যাঁরা স্বয়ংসেবকদের সাহায্যে আদর্শ গ্রাম করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের সামনে ৬টি বিষয় রাখা হয়েছিল।

(১) **ক্ষুধামুক্ত গ্রাম :** এ কথার অর্থ হলো গ্রামের কেউ অনাহারে থাকবে না।

(২) **রোগমুক্ত গ্রাম :** নিজেদের গ্রামকে রোগমুক্ত রাখার জন্য গ্রামের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর, পরিষ্কার করার মতো যোগ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

(৩) **নেশামুক্ত গ্রাম :** নিজের গ্রামকে নেশামুক্ত করার জন্য মদ, জুয়া, গুটকা ইত্যাদির ব্যবহার যাতে না হয় তা দেখতে হবে।

(৪) **বিবাদ মুক্ত গ্রাম :** গ্রামকে বিবাদমুক্ত রাখতে হলে গ্রামের বিবাদ গ্রামের মধ্যেই মিটাতে হবে। গ্রাম থেকে কোনো লোক

বিচারের জন্য পুলিশ থানা বা আদালতে যাবে না। শুধু তাই নয়, গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন নির্বিরোধ হতে হবে। কোনোরকম দলগত বিভাজনের মাধ্যমে নির্বাচন নয়।

(৫) **শিক্ষাযুক্ত গ্রাম :** নিজেদের গ্রামকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। প্রৌঢ় স্বাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে একজনও বালক-বালিকা ও স্কুলশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না। মাঝপথে কেউ স্কুল ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকবে না। শিক্ষার সঙ্গে সংস্কার দেওয়ার কাজ করতে হবে।

(৬) **সমরস গ্রাম :** নিজেদের গ্রাম সমরসতা পূর্ণ হবে। ছোঁয়াছুঁয়ি, উঁচু-নীচু ইত্যাদি জাতিভেদের উপরে উঠে সকলে আমরা ভারতমাতার সন্তান এই ভাব নিয়ে গ্রামে সবাই বাস করবেন। এই সমস্ত বিষয় সফলভাবে যে সব গ্রামে কার্যকরী হয়েছে সেইরকম ২৩ জন পঞ্চায়েত প্রধানদের কার্যক্রমে সম্মানিত করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা বর্তমানে হাজার হাজার গ্রামে কার্যকরী হচ্ছে। আজ এই সব খবর কেবল তত্ত্বকথা বা কল্পনা নয়। বরং বাস্তবে দেখা যাচ্ছে। এসব দেখে প্রত্যেক ভারতীয়র মনে গর্ববোধ হচ্ছে। সমাজের প্রবীণ অনুভবী ছাড়াও যুবকরাও অধিক সংখ্যায় এই কাজে সক্রিয় হচ্ছেন। গবাদি পশু-নির্ভর জৈবিক কৃষি, শক্তি, জল, পরিবেশ ইত্যাদির উপরে অনেকেই কাজ করছেন। যেসব গ্রামে এসব বিষয়ের একটা ছোটো প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে তা সবাইকে সমাজকল্যাণকারী কাজ করতে প্রেরণা জোগাবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, সম্পূর্ণ বিশ্বের কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠ আদর্শের দ্বারা সুখ, শান্তি ও মঙ্গলময় জীবনের জন্য দিশা দেখানোই ভারতের ঈশ্বর প্রদত্ত কার্য। স্বামীজীর এই ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য আমাদের সকলকে সহযোগী হওয়া প্রয়োজন। ▯

আসানসোলে করোনা রোগীর সেবায় স্বদেশ বিকাশ কেন্দ্র

রাজেশ সাউ

ভারতে যখন করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয় তখন দেশবাসী অসহায় এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সারা দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা বেসামাল হয়ে যায়। এই দৃশ্য পশ্চিমবঙ্গেও দেখা গেল। করোনার সংক্রমণ এখানেও বহুগুণ বেড়ে গিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করে তোলে। এইরকম ভয়ানক পরিস্থিতিতে আসানসোলের স্বদেশ বিকাশ কেন্দ্র এখানকার মানুষজনদের পশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কেন্দ্রের কার্যকর্তারা স্থানে স্থানে স্যানিটাইজেশন অভিযান করে। ১৩টি গ্রামে অক্সিমিটার বিতরণ করা হয়। ৩টি অক্সিজেন কন্সেন্ট্রেটর বিভিন্ন স্থানে কার্যকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় যাতে সংক্রামিত মানুষ প্রয়োজনে অক্সিজেন পেতে পারেন। কিছু গ্রামে বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের সঙ্গে মিলে বাচ্চাদের পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির সঠিক চিকিৎসা যাতে হয় তার জন্য কার্যকর্তারা বিভিন্ন হাসপাতালের বেডের খোঁজখবর রোগীর পরিজনদের দিতে থাকে। এখন যখন করোনা পরিস্থিতি একটু কম ভয়াবহ দেখা যাচ্ছে, আমাদের শিশু সংস্কার কেন্দ্র, পাঠদান কেন্দ্র, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি পুনরায় শুরু করা হয়েছে। অধিকাংশ স্থানে দিদিভাইরা অনলাইনের মাধ্যমে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি সামাজিক বিধি পালন করে চালানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটি সত্যি ঘটনার অভিজ্ঞতা পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নেব। দুর্গাপুরের এক ব্যক্তির করোনা সংক্রমণের ফলে আসানসোল জেলা হাসপাতালে মৃত্যু হয়। কারো সহায়তা না পেয়ে ওই মৃত ব্যক্তির ১২-১৩ বছরের ছেলে এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ে, কোনো সূত্রে খবর পেয়ে স্বদেশ বিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদক কার্তিক দাশগুপ্ত এক সঙ্গীকে নিয়ে মৃতদেহ প্যাকিং করে, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থাও করেছেন।

ভারতে মানুষের সেবা মানে ঈশ্বরের সেবা

প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দুধর্মে সেবা একটি মহত্বপূর্ণ কর্ম। আমরা অতিথি সেবা, পীড়িতদের সেবা, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা ইত্যাদি শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত। প্রায় সব হিন্দু-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কোনও না কোনও সেবা কাজের সঙ্গে যুক্ত। এইজন্য কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সহ নানা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সারা দেশে ছড়িয়ে আছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। হিন্দুরা দেবতাজ্ঞানে জীবের সেবা করে থাকে, তাই স্বামীজী শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা বলেছেন। দরিদ্র মানুষকে আমরা নারায়ণজ্ঞানে সেবা করি, তার মধ্যেই নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করি বলে তাঁদের সেবা করাকে 'দরিদ্র নারায়ণ সেবা' বলা হয়েছে। আর এই কাজ নিঃস্বার্থভাবে, পবিত্রভাবে, সংযতচিত্তে করতে হয়। প্রতিদানে কোনও কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নয়। কারণ সেরকম সেবা, যা খ্রিস্টান মিশনারিরা করে থাকে, সেটা সেবা নয়। কারণ সে সেবার পেছনে ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে। দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর ভাষায়, সেবা হলো— একমুখী প্রক্রিয়া। এখানে সেবক সেবার মাধ্যমে আত্মবিকাশের অবকাশ পায়। কোনও ব্যবসায়িক লেন-দেনের মনোভাব থাকলে তাকে সেবা বলা যায় না। স্বামীজীর বিখ্যাত বাণী হলো, ''জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'' তিনি বলেছেন, কত লোক কত প্রাণী জন্মাচ্ছে, মরে যাচ্ছে কিন্তু তাতে জগতের কী আসে যায়? এর মধ্যে তুমি যদি তোমার অমূল্য মানবজীবন পরের সেবার জন্য, অপরের কল্যাণের জন্য দিতে পার, তবেই জীবন সার্থক। দেশমাতৃকা সহস্র সহস্র যুবক বলিদান চান। তাই তিনি আরও বলেছেন ''ভুলিও না! তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত''। যেহেতু স্বামীজী নারায়ণ জ্ঞানে সেবার কথা বলেছেন তাই এই মহান ব্রত পালনের সময় কখনও ভাবলে চলবে না অপরের উপকার করছি। তাঁর মতে, তুমি যে অপরের সেবা করছ, সেজন্য সবসময় ভাববে অপরের সেবা করে তুমি নিজেই ধন্য হয়ে যাচ্ছ, এতে তোমারই আত্মবিকাশ হচ্ছে, তুমিই উপকৃত হচ্ছ বেশি, কারণ এর দ্বারা তোমার অন্তঃকরণে দেবত্বের উদ্বোধন হচ্ছে। এর মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা। তাই কবি গেয়েছেন, ''আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনীপরে, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে''। তাই ওই কবি, যিনি অবশ্যই হিন্দু-চেতনায় উদ্বুদ্ধ, তিনি পরের জন্য নিজের স্বার্থকে বলিদান দেওয়ার মধ্যে যে মহাসুখ আছে তা উপলব্ধি করার জন্য বলেছেন ''পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এ জীবন মন সকলি দাও, তার মত সুখ কোথাও কি আছে? আপনার কথা ভুলিয়া যাও''। এই হলো হিন্দুজাতির জীবনদর্শন। এই সেই জাতি যে জগতের সকল প্রাণীর সুখ-শান্তি কামনা করে, 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ' —এই বলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। পৃথিবীতে কোথাও কি এর তুলনা আছে? এই হলো হিন্দু-পরম্পরা। হিন্দুর সেবাধর্মে তাই কোনও লেনা-দেনার ব্যাপার নেই। এ সেবা পয়সার বিনিময়ে মানুষের উপকার করার মতো ব্যাপারই নয়। এ সেবা ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাজের মতো কাজ বা পৌর-প্রতিষ্ঠান, স্কুল-হাসপাতাল প্রভৃতির মতো কাজ নয় যেখানে অর্থের লেন-দেনের ব্যাপার থাকে।

সেবার এই মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুগে যুগে, স্মরণাতীত কাল থেকে হিন্দু জাতির মহাপুরুষগণ ও মহীয়সী মাতৃমণ্ডলী অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ শিবি রাজার দান কাহিনি, রাজা হরিশচন্দ্র, থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক যুগের হর্ষবর্ধন প্রভৃতি অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো চরিত্রের উল্লেখ করা যায়।

আবহমান কাল থেকে চলে আসা সেবার এই অমর কাহিনিগুলির মধ্যে নিকট অতীতের কয়েকটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্লেগরোগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল। স্বামীজী এই রোগ প্রতিরোধের সমস্ত দায়িত্ব দিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতার উপর। একটি প্লেগ কমিটি তৈরি হয়েছিল। নিবেদিতা ছিলেন তার সম্পাদিকা, স্বামী সদানন্দ ছিলেন তার কর্মাধ্যক্ষ। তিনি ধাঙড় দিয়ে শ্যামবাজার-বাগবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের বস্তিগুলি সাফ করাতে লাগলেন আর নিবেদিতা যেন দশভুজা হয়ে কাজের সব দিকটা দেখাশুনা করতে লাগলেন। কাগজে লেখালেখি করে সাহায্যের আবেদন জানালেন, স্বামীজীর সঙ্গে ক্লাসিক থিয়েটারে গিয়ে 'প্লেগ ও ছাত্রদের কর্তব্য' বিষয়ে বক্তৃতা করতে লাগলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে কিছু কিছু ছাত্র প্লেগ-সেবার কাজে যোগ দিল। নিবেদিতার অতুলনীয় সংগঠনী শক্তি, সাহস ও অসীম করুণা সমাজে রেখাপাত করেছিল। পাড়ায় পাড়ায় তিনি প্লেগ প্রতিরোধের 'হ্যান্ডবিল' বিলি করতেন। একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন বাগবাজার পল্লীর এক রাস্তায় জঞ্জালের স্তূপ জমে আছে, অথচ কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। তখন নিবেদিতা নিজেই ঝাড়ুহাতে রাস্তা পরিষ্কার করতে এগিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে

পাড়ার যুবকরা লজ্জিত হলেন, তাঁরা এসে নিবেদিতার হাত থেকে ঝাড়ু কেড়ে নিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে শুরু করলেন।

সেই সময়কার সুবিখ্যাত চিকিৎসক (যাঁর নামে উত্তর কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ আছে সেই ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর) লিখেছেন ঃ '১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্লেগ সংহারকরূপে দেখা দেয়।.....সেই সময় একদিন চৈত্রের মধ্যাহ্নে রোগী-পরিদর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, দ্বারপথে ধূলিধূসর কাষ্ঠাসনে একজন য়ুরোপীয় মহিলা উপবিষ্ট। ইনিই ভগিনী নিবেদিতা; একটি সংবাদ জানিবার জন্য আমার আগমন প্রতিক্ষা করিতেছেন।' সেদিন সকালেই ডাঃ কর এক বাগদি বস্তিতে এক প্লেগ রোগাক্রান্ত শিশুকে

দেখতে গিয়েছিলেন। নিবেদিতা সেটা জানতেন এবং তারই খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তিনি ওখানে অপেক্ষা করছিলেন। ডাঃ কর জানালেন যে শিশুটির অবস্থা সঙ্কটজনক। তিনি নিবেদিতাকে আরও সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে যেহেতু প্লেগ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে, তাই এই যে তিনি রোগীদের ঘরে ঘরে ঘুরছেন তাতে তাঁর নিজেরও সাবধান থাকা উচিত। কিন্তু বিকেলবেলা ডাক্তারবাবু আবার যখন সেই শিশুরোগীটিকে দেখতে গেলেন তখন তিনি স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন যে নিবেদিতা তাঁর সব সতর্কবাণী উপেক্ষা করে ভাঙাচোরা স্যাঁতসেঁতে কুঁড়েঘরে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে আছেন আর শিশুটির তখন মা মারা গেছে। রাতের পর রাত দিনের পর দিন তারপর নিবেদিতা সেই শিশুটির সেবা করলেন। কিন্তু শিশুটিকে বাঁচানো গেল না। মৃত্যুর আগে শিশুটি নিবেদিতাকেই 'মা মা' বলে ডেকে জড়িয়ে ধরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। ভগিনী নিবেদিতা নিজের জীবনে সেবার এই উজ্জ্বল মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশভক্তরাও তাঁদের জীবনে সেবাধর্মের আদর্শ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মহানায়ক সূর্য সেনের জীবনকাহিনি থেকে আমরা এইরকমই এক দৃষ্টান্ত পাই। এই সর্বত্যাগী বীর তাঁর সংগঠনের জন্য মানুষের কাছ থেকে ব্যক্তিগত দান, স্বদেশ প্রেমিক মা-বোনেদের স্বেচ্ছাকৃত দানে তহবিল গড়ে তোলা ছাড়াও নিজে টিউশনি করে যা রোজগার করতেন, তার একটি পয়সাও খরচ না করে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সীমিত ব্যয় করে, কত গরিব, দুঃস্থ ছেলেকে পরীক্ষার ফি, বই কেনার টাকা, স্কুলের বেতন যে জুগিয়েছেন তার হিসেব নেই। একবার নিজের মাইনের টাকা যা পেয়েছিলেন তার সবটাই সেবার কাজে লাগিয়ে দু'দিন কেবল চা খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এ সময় তাঁর হাতে একটি পয়সা কিংবা ঘরে একমুঠো চাল পর্যন্ত ছিল না। প্রদীপ যেমন নিজে জ্বলে অন্ধকারে আলোক বিতরণ করে, একজন সেবক তেমনি নিজের প্রাণের জ্যোতি জ্বালিয়ে জগতের কল্যাণ করে নিজেকে ধন্য মনে করে।

''আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ''—কবির এই উক্তি যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের সম্পর্কে বলা যায় তাঁদের একজন হলেন ডাক্তার কেশবরাও বলিরামরাও হেডগেওয়ার। এঁর প্রতিষ্ঠিত মহাসঙ্ঘ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নাম অনেকে শুনলেও তিনি প্রচারের প্রায় আড়ালেই থেকে গেছেন। মহাভারতের পথের দিশারি এই মহাপুরুষের জীবনও সেবার আলোকে উদ্ভাসিত। ১৯১৩ সালে বাঙ্গলায় ভীষণ বন্যা হয়েছিল। যেদিকে তাকানো যায়, শুধু জল আর জল। গ্রামের পর গ্রাম, ক্ষেতের পর খেত ভেসে গেছে। বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তখন ইংরেজ রাজত্ব। তারা সাধারণ মানুষের দুর্দশা দেখেও উদাসীন। যারা বেঁচে গেছে, সেই গৃহহীন, বস্ত্রহীন, অন্নহীন মানুষের দল কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জনে জনে তাদের দুঃখের কথা জানাচ্ছে। কিছু যুবক সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন। তাদের মধ্যে কেশবরাও একজন। তিনি তখন কলকাতা ন্যাশান্যাল মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ছিলেন এবং কলকাতার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। পড়াশুনো শিকেয় তুলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে সেবাকাজে যোগ দিলেন। নাওয়া-খাওয়া ভুলে তিনি গ্রাম-গ্রামান্তরে কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও নৌকায়, কখনও সাঁতার কেটে ঘুরতে লাগলেন। ডুবন্ত বালক-বৃদ্ধদের উদ্ধার করা, কাদার মধ্যে ঘুরে ঘুরে বুভুক্ষু মানুষকে চিড়ে-মুড়ি বিতরণ করা এইসব করে বেড়িয়েছেন। এইসময় এমন হয়েছে যে তাঁর জলে ভেজা কাপড় গায়েই শুকিয়েছে, নিজের খাদ্যও অনেক সময় জোটেনি— এমনকী ভালো করে ঘুমোতেও পারেননি। গ্রামবাসীদের সেবায় নিজেকে সর্বপ্রকার অহংকার থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। 'পরের উপকার করছি' এ ভাবনা তিনি কখনও মনে স্থান দেননি। মাঝে মাঝে বলতেন—''এরা কি পর? এরা তো আমার পরমাত্মীয়।'' এই কাজে তিনি আনন্দ অনুভব করতেন। তিনি দেখিয়ে গেছেন যে সেবার কাজে কেমন স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করা যায়।

সেবাব্রতের এই পুণ্য আবহে যিনি অবগাহন করেছেন তিনিই প্রতিষ্ঠা করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। নামেই এর পরিচয়। নিজ প্রেরণায় ও স্বেচ্ছায় দেশের জন্য যারা কষ্ট স্বীকার করে, সময় দেয়, নিজের অর্থও সমর্পণ করে, সেই নিঃস্বার্থবুদ্ধি, দেশভক্তিতে পরিপূর্ণ, অনুশাসনবদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্ঘকেই বলা হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা পরিকল্পিত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশের আপদে বিপদে সবসময়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং সেবার অনুপম নিদর্শন রেখেছে। যুদ্ধ, বন্যা, ভূমিকম্প, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত মানুষের বিপদ কোনও কিছুতেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা নিস্পৃহ থেকে ঘরে বসে থাকতে পারে না। কবির ভাষায়, গানের কথায় তারা সব সময়ই 'আপন হতে বাহির হয়ে' বাইরে

দাঁড়িয়েছে, 'সবার মাঝে বিশ্বলোকের সাড়া' অনুভব করেছে। সেই ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর পশ্চিম পাকিস্থানে ভয়ংকর হিন্দু-সংহারের সময় আক্রান্ত হিন্দুদের নিরাপদে সীমান্ত অতিক্রম করিয়ে ভারতে পাঠানো এবং এর জন্য নিজেদের জীবনকে বাজি রাখা, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণের সময় দিনরাত খেটে সেনাবাহিনীর জন্য শ্রীনগরে বিমান অবতরণ ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়া, ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের সময় সেনাবাহিনীকে সহায়তা, ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনের সময় ভারত-পাক যুদ্ধে সেনাবাহিনীর পাশে থেকে রক্তদান, যুদ্ধরত সৈনিকদের রসদ সরবরাহ প্রভৃতি কাজ পরমোৎসাহে সম্পন্ন করা, নিকট অতীতে কচ্ছের ভূমিকম্পে সেবাকাজ, এবং ২০১৩ সালে উত্তরাখণ্ডের ভয়াবহ দুর্যোগে তীর্থযাত্রীদের উদ্ধারকাজে দুর্গম পাহাড়ি পথে অভিযান, এবং তারপর ওড়িশার বন্যায় উদ্ধারকাজে ২ দিনের মধ্যে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়া ইত্যাদি সেবামূলক কাজে প্রচারের আলোতে না এসে স্বয়ংসেবকরা নীরবে কাজ করে গেছে। এমনকী এই বাঙ্গলায় কয়েকবছর আগে আইলার ও গত বছর আমফান ঝড়ে দুর্গত জনতাকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এমন সব দুর্গম জায়গায় উদ্ধারকার্য চালিয়েছে যেখানে সরকারি কর্মচারীরাও পৌঁছতে পারেনি। বিকিয়ে যাওয়া সংবাদমাধ্যমগুলি সব খবর চেপে গেছে।

বিষ্ণুর নাভী থেকে উদ্ভূত শতদলের উপর উপবিষ্ট ব্রহ্মার মতো এই মূল সংগঠন থেকে সৃষ্ট হয়েছে সমাজ-সেবা ভারতী নামক বিরাট এক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষের বিপুল জনসম্পদের সেবার বিপুল প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই এই সংগঠন তার বহুমুখী কর্মকাণ্ড দিক্‌দিগন্তে বিস্তৃত করেছে। এই সংগঠনের মন্ত্র হল 'সেবা হ্যায় যজ্ঞকুণ্ড, সমিধা সম হম্ জ্বলে'। সেবাযজ্ঞের যে হোমাগ্নি এই মহাভারতে প্রজ্বলিত হয়েছে তার মাধ্যমেই হয়তো আমাদের আরাধ্যা ভারতমাতা পুনরায় আরও ঐশ্বর্যশালিনী হয়ে জগতের সিংহাসনে উপবেশন করবেন।

সেবাকাজে অগ্রণী মঠ-মন্দির

করোনা মহামারীর ভয়াবহ দিনগুলিতে 'নর সেবা নারায়ণ সেবা' ভাবনায় সারা দেশের মন্দিরগুলিও সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা করোনা প্রভাবিত মানুষের জন্য অক্সিজেন, ওষুধ ও কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ব্যবস্থা করেছে।

শ্রীরাম ভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট : অযোধ্যার শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট করোনা পীড়িত লোকেদের জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্সিজেন প্লান্ট বসানোর ঘোষণা করেছে।

শ্রীকাশী বিশ্বনাথ মন্দির ট্রাস্ট : বারাণসীর শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ট্রাস্ট করোনা রোগীদের বাড়িতে অক্সিজেন, ওষুধ ও চিকিৎসা উপকরণ পৌঁছনোর কাজ করেছে। কয়েকটি অক্সিজেন প্লান্টও বসিয়েছে।

কাঞ্চী কামকোটি পীঠম্ মঠ : কাঞ্চী কামকোটি পীঠ করোনা মহামারী সেবা কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রী কেয়ার ফান্ডে ২০ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেছে।

মহাবীর মন্দির ট্রাস্ট, পাটনা : বিহারের পাটনার মহাবীর মন্দির ট্রাস্ট রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সেবা ফান্ডে ১ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির, জম্মু-কাশ্মীর : বৈষ্ণোদেবী মন্দির কর্মচারীরা রাজ্যের সেবা ফান্ডে তাদের একদিনের বেতন দান করেছে। এছাড়া কাটরা বস্তিতে লোকেদের মধ্যে রেশন কিট বিতরণ করেছে এবং শ্রাইনবোর্ড আধিকারিক কমপ্লেক্সে করোনা রোগীদের জন্য ৬০০ বেডের ব্যবস্থা করেছে।

অম্বাজী মন্দির, গুজরাট : মুখ্যমন্ত্রীর সেবা ফান্ডে ১ কোটি ১ লক্ষ টাকা দান করেছে। এছাড়া কয়েক লক্ষ মানুষের মধ্যে ভোজন প্যাকেট বিতরণ করেছে।

শ্রীসাইবাবা সংস্থান ট্রাস্ট : শিড়ি সাইবাবা সংস্থান ট্রাস্ট মুখ্যমন্ত্রী সেবা ফান্ডে ৫১ কোটি টাকা দান করেছে। এছাড়া হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম্, মূক-বধিরদের স্কুল, পুলিশ কর্মচারী ও অন্যান্য লোকেদের ভোজন ব্যবস্থা করেছে।

দেবস্থান প্রবন্ধন সমিতি, কোলাপুর : মহালক্ষ্মী মন্দিরের মাধ্যমে ২ কোটি টাকা মুখ্যমন্ত্রী সেবা ফান্ডে দান করে।

পতঞ্জলি সেবাপীঠ : যোগগুরু রামদেব বাবার পতঞ্জলি যোগপীঠ প্রধানমন্ত্রী কেয়ারফান্ডে ২৫ কোটি টাকা দান করে। সারা দেশের সমস্ত শাখার কর্মচারীরা তাদের একদিনের বেতন দান করেন। এছাড়া সংস্থা ১৫০০ রোগীর জন্য কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করে।

অযোধ্যা মহানগরে সঙ্ঘের আইসোলেশন কেন্দ্র : করোনা রোগাদের জন্য ২৫ বেডের আইসোলেশন সরস্বতী বিদ্যামন্দিরে শুরু করে। রোগীদের খাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা স্বয়ংসেবকরাই করেন।

শ্রীমাতা মনসা মন্দির, হরিয়ানা : মন্দির কর্তৃপক্ষ হরিয়ানা সেবা ফান্ডে ১০ কোটি টাকা দান করে।

স্বামীনারায়ণ মন্দির, বড়োদরা : মন্দির কর্তৃপক্ষ আধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত ৫০০ বেডের ১১টি কেয়ার সেন্টার শুরু করে।

পুরী জগন্নাথ মন্দির : পুরী জগন্নাথ মন্দির প্রশাসন ১২০ বেডের কেয়ার সেন্টার শুরু করে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সেবা ফান্ডে ১.৫১ কোটি টাকা দান করে।

তিরুপতি তিরুমলয় দেবস্থানম্ : মন্দির কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রী সেবা ফান্ডে ১৯ কোটি টাকা দান করে।

কয়েকটি মন্দিরের নাম উল্লেখ করা হলো। এছাড়া সারা দেশে এরকম অসংখ্য মঠ-মন্দির রয়েছে যাদের সহযোগিতাও উল্লেখ করার মতো।

স্বয়ংসেবকরা নিঃস্বার্থ সেবার প্রেরণা কীভাবে পায় ?

ফলকুমার পাত্র

প্রকৃতির নিদারুণ আস্ফালনে এক মুহূর্তে সবকিছু ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ঘনান্ধকারের সঙ্গে শ্মশানের নিস্তব্ধতায় ঢেকে গেল চারিদিক। করোনা মহামারি মানুষের রুটি রোজগার ইতিমধ্যেই কেড়ে নিয়েছে। মানুষের মাথা গোঁজার শেষ আশ্রয়টুকুও কেড়ে নিয়ে গেল বিধ্বংসী সাইক্লোন আমফান। কালোরাত্রি ঘুচে যখন পুব দিগন্তে দিবাকরের উদয়বার্তা ঘোষিত হচ্ছে প্রকৃতির গাছপালা পশু-পাখি সেদিন তখনও ঘুমিয়ে আছে। যেন ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি এসে তার জাদুকাঠি দিয়ে সবকিছুকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম আমার পরিচিত এক স্বয়ংসেবক বন্ধু তার টালির বাড়ির ছবি শেয়ার করেছেন। লিখছেন তার বই, খাতা, বিছানাপত্র সব ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। চারিদিকে এত ত্রাণ এত সহায়তা কিন্তু তাকে কিছু দেওয়া হয়নি। কারণ সে রাষ্ট্রীয় ভাবনায় উদ্বুদ্ধ এবিভিপির সদস্য। আমরা তাকে সহায়তার আশ্বাস দিলাম। খারুই ১ মণ্ডলের স্বপনদার অতি দরিদ্র পরিবার হোসিয়ারি কারখানায় দৈনিক মজুরিতে কাজ করে সংসারটা কোনো রকম চালাতেন সেও আশ্রয়হীন। তাকেও ত্রাণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল কিন্তু ত্রাণ দেওয়ার দিন যা দেখলাম তা সারা জীবনের সম্বল হয়ে থাকবে। তুহিন বলল দাদা একটা অতিরিক্ত ত্রিপল দেওয়া যাবে? জিজ্ঞাসা করলাম কেন? সে বলল আমার পাশের এক দাদার বাড়িটাও ভেঙে গেছে, একটা বড়ো গাছ পুরো বাড়িটার উপর চাপা পড়ে আছে। সে ঘরে ঢুকতে পারছে না।

আমরা বললাম আসলে আমাদের তো সব হিসাব মতো চাওয়া হয়েছে তাই সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে ও বলল ঠিক আছে দাদা আমার ত্রিপলটা ওকে দিয়ে দেব। এখনও মেঘ জমে আছে যে কোনো সময় বৃষ্টি নামবে আবার। যার পড়ার বইপত্র সব ভিজে নষ্ট হয়েছে সে নিজের কথা না ভেবে অন্য জনের কথা ভাবছে। পরে জানলাম সে সত্যি সত্যি সেই ত্রিপল দান করে দিয়েছে। অনেক পরে আবার আমরা ত্রিপল পেয়ে তাকে দিতে পেরেছি। ত্রাণ বিলি করতে করতে একটি প্যাকেট কম পড়ে যায়। খুব অস্বস্তিতে পড়লাম বিশ্বজিৎকে ডেকে দোকানে পাঠাবো ঠিক সেই সময় স্বপনদা বলল দাদা আর পাঠাতে হবে না কোথাও, আমি আমারটা ভাগাভাগি করে নিচ্ছি ওর সঙ্গে। ও আমার পাড়ার ছেলে। যার নিজের সংসার চলে না সেও পারে নিজের ত্রাণ ভাগ করে নিতে। আজ মনে প্রশ্ন জাগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এদের ভেতর কোন সে শক্তির সঞ্চার করেছে যার দ্বারা এরা সমস্ত রকম পরিস্থিতির জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে? নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে আর্তজনের সেবাকে প্রাধান্য দেয়? নিজের প্রাপ্য অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেয়? যেখানে ত্রাণের চাল, ত্রিপল চুরির প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সারা রাজ্যে সেখানে এই প্রকারের নিস্বার্থপরতা এরা দেখায় কী করে? বিবেকানন্দের ভারত, ডাক্তারজীর স্বপ্নের ভারত তোমরাই রচনা করতে পারবে। সারা বিশ্বের মানুষের কাছে স্বয়ংসেবকদের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে থাকার কাহিনি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, সারা বিশ্ব তা নত মস্তকে স্বীকার করবে। কারণ তোমাদের প্রার্থনা যে—

'অজয্যাং চ বিশ্বস্য দেহীশ শক্তিম্
সুশীলং জগদ্ যেন নম্রং ভবেৎ'।

মুর্শিদাবাদে মহামারী মোকাবিলায় স্বয়ংসেবকরা

মন্দার গোস্বামী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ অর্থাৎ আরএসএস-এর অপর একটি অর্থ রেডি ফর সোশ্যাল সার্ভিস। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, অতিমারী, সর্বক্ষেত্রে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা জনসেবায় সর্বাগ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সমগ্র দেশের মতো মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানেও তালে তাল মিলিয়ে স্বয়ংসেবকরা সেবাকাজে এগিয়ে চলেছে। তারই কিছু অভিজ্ঞতা আজ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি। বহরমপুরের খাগড়াগড় এলাকায় একটি প্রভাত শাখা চলে। শাখার পাশেই রয়েছে বস্তি। সকলেই দরিদ্র। অর্থের অভাবে অনেকেই চিকিৎসা করাতে পারে না। তাই সেখানে মুর্শিদাবাদ NMO (National Medicos Organisation)-র সহায়তায় একদিনের চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের পূর্বে আমরা বস্তিতে গিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা কুপন বিলি করে আসি। এরপর নির্ধারিত দিনে শিশু, মহিলা-সহ বহু অসুস্থ মানুষকে ওষুধ-সহ অন্যান্য চিকিৎসা সেবা

দেওয়া হয়। সকলেরই রক্তের শর্করা পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অনেকের ইসিজি করা হয় এবং সমস্ত পরিষেবাই ছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এই শিবিরকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। এলাকায় এমন কার্যক্রম এর আগে কখনোই হয়নি। বিশেষ করে দরিদ্র, অশক্ত, অসুস্থ বয়স্করা, তাঁরা বাড়ির পাশেই এমন পরিষেবা পেয়ে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে যান এবং আগামীদিনেও যাতে এই কার্যক্রম নিয়মিত হয়, তার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। বস্তিবাসীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। শুধুমাত্র এনএমও নয়, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ (এইচজেএম) ও সেবা ভারতীর সক্রিয় সহযোগিতাতেই এমন কার্যক্রম সুচারু ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। এর কিছু পরেই আসে করোনা নামক ভয়াবহ অতিমারী। সম্পূর্ণ অজানা একটি রোগ। কোনও প্রতিষেধক নেই। সতর্ক থাকাটাই ওষুধ। লকডাউন শুরু হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হলো। মানুষের হাতে কাজ নেই, অর্থ নেই, খাবার নেই। এই পরিস্থিতিতে প্রথমেই স্বয়ংসেবকদের নিয়ে একটি টিম বানানো হলো। কিছু সহৃদয় মানুষের অর্থানুকূল্যে মাস্ক, স্যানিটাইজার, সাবান কিনে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম শুরু করলাম। অনেকেরই মাস্ক স্যানিটাইজার কেনার সামর্থ্য ছিল না, তাঁরা প্রবল আগ্রহে এগুলি গ্রহণ করলেন। এরই সঙ্গে শুরু হলো খাদ্য সামগ্রী বিতরণের কর্মসূচি। সংলগ্ন সেবাবস্তি এলাকা তো বটেই, দূরবর্তী কিছু এলাকাতেও বিশেষ করে বনবাসী, জনজাতি এলাকাতে চাল, ডাল, আলু, তেল, ডিম, সোয়াবিন, বিস্কুট, মুড়ি, লবণ-সহ নিত্য ব্যবহার্য কিছু সামগ্রী প্রদানের কাজকর্ম নিয়মিত চলতে থাকল। সেবাকাজে উপরোক্ত বিবিধ সংগঠনগুলি পূর্বের মতোই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। কিছু জায়গায় খ্রিস্টান মিশনারিগণ সেবার আড়ালে ধর্মান্তরকরণের পরিকল্পনা করেছিল। স্বয়ংসেবকদের সেবামূলক কাজ আর সাংগঠনিক দৃঢ়তার সামনে সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। সন্ন্যাসীডাঙ্গা, উগ্র, খোরদীঘি, তারাকপুর, বাদরা, হরিদাস মাটি, হাতা কলোনি মুর্শিদাবাদের এই পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলি-সহ আরও কিছু স্থানে যতটা সম্ভব খাদ্য সামগ্রী দুঃস্থ ব্যক্তিদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। বস্তি কতটা অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর হতে পারে, তা কাশিম বাজার রেল স্টেশন লাগোয়া বস্তিতে না গেলে কখনই বুঝতে পারতাম না। সর্বত্র কাঁচা বাড়ি— ড্রেনেজ সিস্টেম বলে কিছুই নেই। চতুর্দিকে নোংরা, বেশিরভাগই হতদরিদ্র লোকেদের বাস। সেখানে বাড়ি বাড়ি কুপন বিতরণের মাধ্যমে সেবা বস্তির প্রত্যেককে রান্না করা খাদ্য সরবরাহ করা হলো, এক্ষেত্রে বহরমপুর হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যমী সদস্যদের অবদান অনস্বীকার্য।

লকডাউনে বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যায়। পড়ুয়াদের মধ্যে পড়াশুনো করবার উৎসাহ কমে আসে। কর্মহারা, আয় কমে যাওয়া অনেক অভিভাবকের পক্ষে খাতা কলম কিনে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই খাগড়া প্রভাত শাখার উদ্যোগে তিনবার সংলগ্ন সেবাবস্তির পড়ুয়াদের সকলকে খাতা, কলম, রুল পেন্সিল, মাস্ক, স্যানিটাইজার, সাবান প্রদান করা হয়। এর পূর্বে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে সেবা বস্তির প্রত্যেক ঘরে ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আর্সেনিক অ্যালবাম পৌঁছে দেওয়া হয়। সমাজে স্বচ্ছতা কর্মীদের নিরলস, কঠোর পরিশ্রমের কারণেই আমরা স্বচ্ছ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে পারি। করোনার মতো মহাসংক্রামক রোগের মধ্যেও তাঁরা তাঁদের পরিষেবা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চালিয়ে গেছেন। তাই একদিন বহরমপুর নগরে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে, ফল, গ্লুকোজ, স্যানিটাইজার, গ্লাভস, সাবান প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের বিশেষ ভাবে সম্মানিত করা হয়।

এই মহতী অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমরাও নিজেদের ধন্য মনে করি। এছাড়াও গত জুন মাসে টানা ১৭ দিন গড়ে ২০০ জন ব্যক্তিকে তৈরি করা খাবার প্রদান করা হয়। দুমুঠো আহার পেয়ে কত দুঃস্থ, বয়স্ক মানুষ, অশ্রুসজল চোখে স্নেহাশিস দিয়েছেন। অনেকেরই মলিন বসন, শীর্ণ চেহারা, কিন্তু একমুখ অনাবিল হাসি নিয়ে ফিরে গেছেন। এই অনুভব জীবনে এক পরম পাওনা।

মুর্শিদাবাদের কান্দিনগরের স্বয়ংসেবকরা করোনা রোগীদের সেবায় তৎপর ছিলেন

বর্তমানে করোনার সংকটকালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার স্বয়ংসেবকরা সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ম মেনে প্রতিনিয়ত সমাজের দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যার্থে সেবা কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য সরবরাহ থেকে শুরু করে, অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌঁছানো, স্বাস্থ্য বিধি ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস— এরকম সমস্ত রকমের সেবা কাজ স্বয়ংসেবকরা প্রতিনিয়ত করে চলেছে। বিভিন্ন রকম সেবা কাজে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হয়েছেন এবং বিভিন্ন সময় তারা এই সেবা কাজকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানান এবং সেই কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

জেলার কান্দি নগরে বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা বিভিন্ন সেবাকাজ করা হয়, তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সেবাকাজ হলো অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করা। করোনার অতিমারীতে যখন অক্সিজেনের সংকট চরম পর্যায়ে ছিল তখন এই নগরে চারটি অক্সিজেন সিলিন্ডার সর্বক্ষণের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। যার ফলে ওই নগরের প্রায় ৬০ জন করোনা আক্রান্ত রোগী উপকৃত হয়েছেন। এরকম সাহায্য পেয়ে সকলেই স্বয়ংসেবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। এদের মধ্যে যেমন, এই নগরের কান্দি বাজার এলাকার উৎপল সিনহা যিনি পেশায় একজন চিকিৎসক, তাঁর মা করোনা আক্রান্ত হওয়ার ফলে অক্সিজেনের খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং কোথাও অক্সিজেন সিলিন্ডার না পাওয়ায় অসহায় অবস্থায় পড়েন। এই সংবাদ ওই এলাকার স্বয়ংসেবকদের কাছে পৌঁছানোর পর ডাক্তারবাবুর মায়ের জন্য স্বয়ংসেবকরা অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করেন এবং তাঁর বৃদ্ধা মা সেই অক্সিজেনের সাহায্যে পরবর্তীতে করোনা মুক্ত হন। উৎপলবাবু নিজে এই সেবা কাজে অত্যন্ত আপ্লুত হন এবং স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে পরবর্তীতে যোগাযোগ করেন এবং তাদের এই সেবা কাজের জন্য আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এই নগরের কল্যাণপুরের বাসিন্দা তীর্থ দত্তের পরিবারের এক সদস্য করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর অক্সিজেনের এতটাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, অক্সিজেন ছাড়া সেই ব্যক্তিকে বাঁচানো সম্ভবপর ছিল না। এমতাবস্থায় স্বয়ংসেবকরা খবর পেয়ে তাঁর কাছে অক্সিজেন পৌঁছিয়ে দেয় এবং সেই অক্সিজেন নিয়ে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান এবং পরবর্তীতে করোনা থেকে মুক্ত হন। এই ঘটনায় তীর্থ দত্ত মহাশয় এবং তার পরিবার সঙ্ঘের এই সেবা কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং স্বয়ংসেবকদের আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আতঙ্কের পরিবেশেও বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদ সেবা কাজে তৎপর

মলয় কালি

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার জন্মশতবর্ষে ১৯৮৯ সালে বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের প্রথম সেবা কাজের সূচনা। তৎকালীন ইছাপুর অঞ্চলের হেতেডোবা গ্রামের মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিঃশুল্ক হোমিওপ্যাথি কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছিল। ওই চিকিৎসা কেন্দ্র আজও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতেও আমাদের বিভিন্ন চিকিৎসা পরিষেবা বিশিষ্ট চিকিৎসকদের পরিচালনায় চলছে। সচেতনতা শিবির ও অক্সিজেনের জন্য আমরা বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে একযোগে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের দিদিভাইদের দ্বারা প্রস্তুত আর্য়ুবেদিক পাচন (কারা) ভবনে আগত বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিতরণ করায় করোনা প্রতিরোধে বিশেষ ভবে সাহায্য করছে। যোগ প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও আমাদের দিদিভাইদের মাধ্যমে যোগাভ্যাস করিয়ে করোনা প্রতিরোধে এবং সুস্থ জীবনের ধারা বজায় রাখবার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

শিক্ষা কর্মসূচিতে এই অঞ্চলে মানুষের মধ্যে বিশেষত বনবাসী ও অনগ্রসর গ্রামের মানুষদের বিশেষ ভাবে সহযোগিতা পাওয়া যায়। শিশু সংস্কার, পাঠদান, অঙ্কন এবং কম্পিউটার পশিক্ষণ কেন্দ্র এই অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আর্কষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের সিএসআর প্রকল্পের মাধ্যমে কাজোড়া কুষ্ঠ কলোনিতে জল পরিষেবা এবং শিশু সংস্কার কেন্দ্র পরিচালনা করে ওই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আশার আলো দেখাতে পেরেছে পরিষদ। দুরভাষের সহযোগিতায় গত ১৫ মাসের করোনা মহামারীর মধ্যেও নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান অব্যাহত ছিল পরিষদের অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সহযোগিতায়। শিশু সংস্কার কেন্দ্র কখনোও বন্ধ করা হয়নি, দিদিভাইদের সহযোগিতায় শিশুদের সময় কমিয়ে নিত্য সংস্কার পদ্ধতি ওই মহামারীতেও অব্যাহত আছে।

সেলফ্ হেল্প গোষ্ঠীগুলি নিত্যকর্ম পদ্ধতি চালু রেখে মহামারীতেও পরিবারের আর্থিক দিকের সহযোগিতা বজায় রেখেছে। মাতৃমণ্ডলী ও ভজন মণ্ডলীর নৈমিত্তিক কার্যক্রম করোনা বিধি মেনেই এখনো চালিয়ে যাচ্ছে। করোনা বিধির মান্যতা এবং সুরক্ষিত ভাবে আমাদের গোষ্ঠীগুলি চালের বিশেষ প্রকার ভাজা 'ফুরফুরে', কাগজের ঠোঙ্গা, ডালের বড়ি ও হাতে ভাজা মুড়ি তৈরি করছে। সেলাইয়ের ছাত্রীরা বিশেষ রকমের গয়নাও তৈরি করার কায়দা রপ্ত করে নিজের উপার্জন বারবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান আতঙ্কের পরিবেশ এবং নিজে সুরক্ষিত থাকা, একই সঙ্গে আমার গ্রাম, পাড়া সুরক্ষিত থাকুক এই মানসিকতা নিয়ে বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের কার্যকর্তারা সমাজের নিত্য সংস্কার ও সেবা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রী ভগবানের কৃপায় সংকল্প নিয়ে আগামীতে কাজের পরিসরকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা রাখার অঙ্গীকার করছি।

স্বয়ংসেবদের সঙ্গে সেবা কাজের অভিজ্ঞতা

প্রলয় কুমার ঘোষাল

কামারপুকুর ও গোঘাট সংলগ্ন এলাকার স্বয়ংসেবকরা করোনা মহামারীতে এক পুণ্য কাজের সঙ্গী হতে পেরে ধন্য বোধ করেছেন। করোনা নামক ভাইরাসটি ২০১৯ সালেও সাধারণ মানুষ তথা সমাজের কাছে ছিল অজ্ঞাত। তার সঙ্গে জুড়ে গেল আরও একটি বিশেষ কথা যার নাম লকডাউন। লকডাউনের অর্থ অপ্রস্তুত সমাজের কর্মহীন হওয়া ও ভাঁড়ারে টান পড়ে যাওয়া। এইরকম এক দুঃসময়ে স্বয়ংসেবকরা কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নেমে পড়লাম সেবা কার্যে। আরামবাগের পাশ দিয়ে প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর নদীর পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত অর্থাৎ হুগলীর শেষ অংশ, বাঁকুড়ার কিছু অংশ, পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু অংশ মোট ২৬৬টি গ্রামে সেবাসামগ্রী নিয়ে আমরা পৌঁছাতে পেরেছিলাম। এছাড়াও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া থেকে আগত শ্রমিকদের শিশু-সহ পরিবারগুলির কাছে আমরা পৌঁছালাম সেবা সামগ্রী নিয়ে। সেবা সামগ্রী পাবার পরে আনন্দমুখর মুখগুলির ছবি আজও স্মৃতিতে এক অভাবনীয় তৃপ্তির স্বাদ এনে দেয় মনে। আমাদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের বহু মহারাজ এই সেবা কাজে প্রতিনিয়ত সঙ্গী হয়েছিলেন। চমকাইতনা গ্রামের প্রথম প্রান্তে সেবা সামগ্রী বিতরণ করে শেষ প্রান্তে অন্য মানুষদের বিতরণ পর্ব চলছে, এমন সময় মহারাজ বলে উঠলেন, এইসব মানুষদের এই মাত্র দেওয়া হলো তো? আমরা বললাম এরা অন্য জন। আসলে সাদা কাপড়ে লালচে ছোপ অর্থাৎ ময়লা সাদা কাপড় পরিহিতা, তেল না পাওয়া চুল এইসব দ্রারিদ্রের ছাপ মহারাজকে উদ্‌বেলিত করেছিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আরও একবার বেশি পরিমাণে সেবা সামগ্রী বিতরণের। সকালে রওনা দিয়ে গরিব দুঃস্থ মানুষদের নামের তালিকা তৈরি, বিতরণের স্থান নির্বাচন করা আবার দ্বিপ্রহরে এই অসহায় মানুষের সঙ্গে সেবা সামগ্রী তুলে দেওয়া, সন্ধ্যায় আবার পরের দিনের সেবা সামগ্রীর প্যাকেট তৈরি করা। —এই ভাবেই ক্লান্তিহীন এক অভাবনীয় আনন্দের সঙ্গে কয়েকটি দিন কাটানোর যে আনন্দ তা বোধহয় কোনো কিছুর সঙ্গে পরিমাপ করা হয় না। এই ২৬৬টি গ্রামে রূপরেখা তৈরি করে, তার সঠিকভাবে বণ্টন করা— এগুলি স্বয়ংসেবকরা একসূত্রে গাঁথার ফলে সেবাকাজ অনেক সহজ থেকে সহজতর হয়েছে। ঠাকুর, মা, স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করি, করোনা যেন বিদায় নিক কিন্তু সেবা কাজের সুযোগ থেকে কখনো বঞ্চিত না হই। ঈশ্বরও বোধহয় এই সেবাকাজ করার জন্য আমাদের স্বয়ংসেবক হতে বললেন।

সেবাকাজ স্বয়ংসেবকদের রক্তে মিশে আছে

সুব্রত সামন্ত

বিগত দু' বছরে কোভিড-১৯-এর প্রভাবে দুনিয়া আক্রান্ত। আমাদের দেশও। ২০২০ সালে দেশে লকডাউন ঘোষিত হয়। সাবধানতার জন্য মিডিয়া যখন বিশেষ কাজ ছাড়া ঘরে থাকার কথাই লিখছে যখন পরিস্থিতি প্রতিকূল অবস্থায়, যখন প্রশাসনিক অসহযোগিতা চরমে, সেই পরিস্থিতিতে দেশ তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে বর্ধমান জেলার স্বয়ংসেবকরাও ছিলাম কাজ হারানো, অসহায়, দুঃস্থ মানুষ ও তাদের পরিবারের পাশে। এই সময় প্রশাসনিক অসহযোগিতা সত্ত্বেও বিকল্প কৌশলে পৌঁছে গিয়েছিলাম গ্রামে ও শহরের বসতিতে খাদ্যদ্রব্য, মাস্ক ওষুধপত্র নিয়ে। শহরে বসতি যোজনায় সাফাইকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়, তাদেরকে সম্মানিত ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। বলাবাহুল্য এই সময় পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে ছিল না।

করোনা মোকাবিলার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংসেবকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল রামমন্দিরের নিধি সংগ্রহের কাজে। সমাজে বিশেষ প্রভাব ও সমাজ জাগরণ লক্ষ্যণীয় ছিল। সঙ্ঘ ও সমাজ একাকার হয়েছিল।

বর্ধমান আলমবাজারের সব্যসাচী রায় নিজের উদ্যোগে ৫ দিন ধরে ১৭০টি পরিবারে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন। তাঁর বাবা শিবমন্দির নির্মাণের জন্য লক্ষাধিক অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, সেই অর্থ করোনা রোগীদের জীবন বাঁচাতে ব্যয় করেছিলেন। সম্প্রতি ইয়াসের প্রভাবে কয়েকটি বসতবাড়ি ধ্বংস হয়েছিল আউসগ্রামে। এগিয়ে এসেছিলেন অনুপম রায়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা করলেন ওই বাড়ি নির্মাণের জন্য।

জাতীয় জীবনের ধারা সেবা ও ত্যাগ। তাই তো স্বামীজী যথার্থই বলেছেন 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

করোনাকালে ইছাপুর সেবা ভবনের সেবা তৎপরতা

মনোজ চট্টোপাধ্যায়

ভয়ংকর করোনার আতঙ্কে যখন সবাই ঘরে বন্দি তখন সেবা কার্যকর্তারা বাইরে বেরিয়ে সেই সমস্ত পরিবার, যাদের না আছে অর্থ না আছে খাদ্য সামগ্রী তাদের কাছে পৌঁছে প্রয়োজনমতো তাদের সাহায্য করে চলেছেন ইছাপুর সেবা ভবন থেকে। অনেকে নিজে থেকে এসেছেন আবার কোথাও কার্যকর্তারা পৌঁছেছেন, এই ভাবেই কাজ চলছিল। বেশ কিছু বনবাসী গ্রামে রেশন সামগ্রী পাঠানো হচ্ছিল। এরকমই একটি গ্রাম কামারহিড়, খুবই প্রত্যন্ত স্থান যেখানে বৃষ্টি হলে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। সেই গ্রামের একটি মেয়ে, নাম বালিকা মুর্মু। সেবা কেন্দ্রে কম্পিউটার শিখতে আসত, সে ফোনে জানায় তাদের গ্রামের কিছু পরিবার খুবই অসহায় অবস্থায় আছে, তাদের জন্য কিছু করা যায় কিনা। সেই সময়ে সাহস করে গ্রামে যাওয়া লোকের সংখ্যা নগণ্য, তবুও সাহস দেখিয়ে কিছু রেশন কিট নিয়ে পৌঁছালে দেখা গেল মেয়েটি কোনো ভুল কথা বলেনি। কিন্তু প্রয়োজনের অনেক কম আমাদের কাছে ছিল অথচ অনেক পরিবার, না আছে ভালো ঘর, না আছে কাজ। প্রায় অনাহারেই তারা জীবন কাটাচ্ছে। মেয়েটি আমাদের নিয়ে প্রায় সব বাড়িতে গেল এবং তাদের সেবা করার জন্য বিচলিত মনে কিছু করার চেষ্টা করছিল। ওর নিজের বাড়ি থেকে কিছু ব্যবস্থা করে তারপর আমাদের খবর দেয়। আমরা যখন জানলাম এখানে কীভাবে রেশন পৌঁছানো যাবে সে তখন নিজে দায়িত্ব নিল। আর পরের দিন ২ জনকে নিয়ে সাইকেল করে ৫ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে সেবা ভবনে উপস্থিত। ১৮টি পরিবারের রেশন নিয়ে সে গেল। এইভাবে প্রতি সপ্তাহে সে রেশন নিয়ে আমাদের জানাত এবং নিজেই তাদের রেশন দিয়ে আসত।

পরবর্তীকালে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের চাল পৌঁছে গেল রেশনের মাধ্যমে তখন খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার কাজ কমে গেল। মেয়েটি কিন্তু বসে থাকল না সেবা ভবনের প্রেরণাতে সে নিজের গ্রামে সংস্কার কেন্দ্র শুরু করলো মে ২০২০ মাসে। নিজে সেবা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে ওখানে পড়াত এবং গ্রামের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কিছু সমস্যা থাকলে সেবা কেন্দ্রের ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ দিয়ে আসতো। যে কাজ আমাদের করতে অনেক সময় লাগত, সেই সেবা কাজকে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিতে মেয়েটির কর্মদক্ষতায় আমরা অবাক। প্রসঙ্গত, এবছর ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। পড়া ছেড়েই দিয়েছিল কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে সেবা কাজের মাধ্যমে এবং সেবা ভবনের কার্যকর্তাদের সহযোগিতায় তার পড়ার ইচ্ছা জাগে এবং সে এখন কঠোর পরিশ্রম করছে পাশ করার জন্য। সেবা ভবন তার পাশে দাঁড়িয়ে বই, খাতা, কলম থেকে সব রকম সাহায্য করে চলেছে। একদিন রাত ৯টার পর ইংরেজি শিক্ষককে ফোন করে সে তার মনের প্রশ্নের উত্তর নিচ্ছে শুনে আমরা অবাক যখন ওই গ্রামের সবাই শুয়ে পড়েছে ও তখন পড়ে চলেছে। উল্লেখ্য, ওই গ্রামে এখনও কেউ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেনি। বনবাসী সমাজের এক সাহসী মেয়ে এবং সমাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ সে এখন একা নয়, এরকম আরও কয়েকজনকে সে নিয়ে এসেছে সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। আমরাও অপেক্ষায় এরকম আরও মেয়ে সেবা বিভাগের কাজে আলোকিত হোক।

চীনা ভাইরাসের দ্বিতীয় তরঙ্গের মোকাবিলায় শিলিগুড়ি সেবা ভারতী

বিশ্বপ্রতিম রুদ্র

চীনা ভাইরাসের প্রথম তরঙ্গের আঘাত আসার সময়ে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত না থাকলেও অতিমারীর প্রকোপ মারাত্মক আকার ধারণ করার আগেই পূর্ণ লকডাউন লাগু হওয়ার কারণে গত বছর এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রথমদিকে খুব ধীরে ধীরে বেড়েছিল। জনমানসে আতঙ্ক খুব বেশি ছিল। কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে আমরা লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলাম। হাসপাতালে হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স, স্বচ্ছতাকর্মী, টেকনিশিয়ান-সহ সবাই মানসিকভবে তৈরি ছিলেন এই অতিমারীর মোকাবিলায়। সেবা ভারতীর উদ্যোগে শিলিগুড়ি নগর ও জেলার বিভিন্ন স্থানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য মার্কিং করা, এলাকা, বাজার, বসতি, থানা স্যানিটাইজেশন করা, কাঁচা ও রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হয়। রাস্তায়, মন্দিরে, ভিক্ষুকদের সেবা, শিশুদের জন্য দুধের ব্যবস্থা, পথের কুকুর, গবাদি পশুর খাবার জোগানো, বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে নানা রকমের সেবাকাজ চলেছে লকডাউনের পুরো সময় জুড়েই। এর মধ্যে কয়েকটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লকডাউন আংশিক শিথিল হতে খবর আসে রাজস্থানের কোটা থেকে তিনটি বাসে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অসমে ফিরছে। শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে ফুলবাড়িতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তাদের জন্য খাবার, জলের ব্যবস্থা করে তুলে দেওয়া হয় তাদের হাতে। একই রকমভাবে খবর আসে অসম, মণিপুর, মেঘালয়ের পরিযায়ী শ্রমিকেরা ট্রেন ভর্তি করে বাড়ি ফিরছে। এই রকম তিনটি ট্রেনে পৌঁছে দেওয়া হয় শুকনো খাবার, জল, ওষুধ, স্যানিটারি ন্যাপকিন। একদিন হঠাৎ বিহার-বাঙ্গলা সীমান্তের খড়িবাড়িতে কার্যকর্তারা খবর পান বিহারের বিভিন্ন ইটভাটায় কাজ করা কোচবিহারের পরিযায়ী শ্রমিকেরা পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরছেন। স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে দ্রুততার সঙ্গে খিচুড়ি রান্নার ব্যবস্থা করে তাদের সবার হাতে তুলে দেওয়া হয় সেই খাবার। ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তে জনজাতি সেবাসমিতিতেও বিশেষ অনুমতি নিয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে খাবার, ওষুধ, মাস্ক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তার সঙ্গে সঙ্গে করোনা আক্রান্ত রোগীর পরিবারে বাজার পৌঁছে দেওয়া, হাসপাতালে খোঁজখবর নেওয়া, ভর্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া সবকিছুই হয়েছে স্বয়ংসেবকদের স্বতঃস্ফূর্ততায়। রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা পুলিশের সংবর্ধনা স্বচ্ছতাকর্মীদের সংবর্ধনা, হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

এই ভাবেই ধীরে ধীরে প্রথম তরঙ্গ কাটিয়ে জীবন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসছিল, আর তার মধ্যেই হঠাৎ করে আঘাত আসে দ্বিতীয় তরঙ্গের। খালি হয়ে যাওয়া কোভিড শয্যাগুলো হঠাৎ করেই ভরে যেতে লাগলো। আবার নতুন করে আতঙ্ক— আক্রান্তের সংখ্যা খুব বেশি। প্রথম তরঙ্গে রোগী হাসপাতালে যেতে ভয় পেতো, দ্বিতীয় তরঙ্গে শয্যার আকাল হয়ে গেল— যোজনা তৈরি হলো দ্রুত। একদিকে হাসপাতালগুলোতে খোঁজখবর করে ভর্তির ব্যবস্থা করা, অন্যদিকে টেলিফোনে চিকিৎসকদের পরামর্শের ব্যবস্থা— প্রায় কুড়িজন চিকিৎসকের সক্রিয় সহযোগিতায় শিলিগুড়ি জেলায় দল তৈরি করা হয়, যাদের সাহায্য পৌঁছে গেছে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতেও। সেবা ভারতী ও এমএমও-র ব্যবস্থায় অনেক করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে নিজের বাড়িতেই। টেলিফোনে উপসর্গ শুনে ওষুধ ও পথ্য তালিকা, টেস্টের পরামর্শ, টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী চিকিৎসা, ভর্তির পরামর্শ দেওয়া হয়। সেবা ইন্টারন্যাশনালের সহায়তায় এসে পৌঁছে গেল অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর, তার ব্যবহারবিধি, ট্রেনিং, মুমূর্ষু রোগীর কাছে তা পৌঁছে দেওয়া— সবটাই চলতে থাকলো উৎসাহের সঙ্গে। স্বয়ংসেবকরা নিজেদের প্রাণের তোয়াক্কা না করেই রোগীদের বাড়িতে ওষুধ, অক্সিজেন সিলিন্ডার, কনসেন্ট্রেটর, বাজার পৌঁছে দিয়েছে নানা স্থানে। যোজনা ছিল আইসোলেশন সেন্টার শুরু করারও : কিন্তু পরমেশ্বরের আশীর্বাদে ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে করোনা প্রকোপ— আমরা দ্বিতীয় তরঙ্গকেও জয় করার মুখে।

এখন সম্ভাব্য তৃতীয় তরঙ্গের প্রস্তুতি। মাঝের সময়টাতে একশো শতাংশ ভ্যাকসিনেশনের চেষ্টা ও সঙ্গে সামাজিক দূরত্ববিধি সমেত অন্যান্য নিয়মাবলী মেনে চলার নিষ্ঠা— যা হয়তো অনেকটাই কম করে দিতে পারে তৃতীয় তরঙ্গের অভিঘাত : একই সঙ্গে সম্ভাব্য বিপদের প্রস্তুতি— স্বয়ংসেবকদের ট্রেনিঙের যোজনা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে, অভিভাবকদের সচেতন করার কাজও চলছে বিদ্যাভারতী, শিক্ষক সংগঠন ও এনএমও-র তরফ থেকে। সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় সমাজ নিশ্চিতভাবেই এই চৈনিক ভাইরাসের হাত থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পেতে সক্ষম হবে।

সামাজিক সমরসতা প্রতিষ্ঠায় চাই শীতল মস্তিষ্ক

শ্রী মোহন ভাগবত

সামাজিক সমরসতা নির্মাণ করাও সঙ্ঘের কাজ। প্রাচীন কালের কথা বাদ দিলেও ১৮৫৭ সালের পর থেকে অনেক সংগঠন ও অনেক মহাপুরুষ এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন। বাস্তবে আমাদের কাজও এ ব্যাপারে নতুন কিছু নয়। ১৯২৫ সাল থেকেই এই কাজ চলে আসছে। বিভিন্ন প্রান্তে এই বিষয়ে কিছু বিশেষ প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মনে হয় সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্রেই এই প্রয়াস শুরু হয়। এমনিতেই সঙ্ঘের শাখায় সমরসতার ভাবনা আছে। কিন্তু, কিছু বিশেষরূপে বা কার্যকর্তাদের বেশ কিছু গোষ্ঠী এ ব্যাপারে যে আলাদা প্রয়াস নিয়েছে তার আসল কারণ—পরিস্থিতি। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজের উপর নানাবিধ আক্রমণ চলছে। ফলে সমাজের দুর্বলশ্রেণী ও উপেক্ষার শিকার লোকজনদের সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশীদার হিসাবে তৈরি করার প্রয়াস চলছে। সামাজিক সমরসতার গুরুত্ব এখানেই, সেটি প্রভাবশালী হলে এইসব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য। এখন সময়ের বদল ঘটেছে। আর্থিক মাপকাঠিতে প্রচুর ভেদভাব সমাজে তৈরি হয়েছে। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মধ্যে বিভাজন স্পষ্ট। এমনকী এদের বাজার, সিনেমাঘর সবই আলাদা। একবার একটি ধনীবাড়ির মেয়েকে দারিদ্রের উপর প্রবন্ধ লিখতে বলা হল। সে লিখল, 'আমরা সকলে গরিব। আমাদের ড্রাইভার গরিব, আমাদের মালী গরিব, আমাদের পরিচারিকা গরিব—তাই আমরা গরিব'। দারিদ্র্যের রূপ যে কেমন সে বিষয়ে ওই মেয়েটির কোনো ধারণাই নেই। এই সবই এখন চলছে। সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণাহীন কোনও স্বয়ংসেবকও যদি এই সব বস্তিতে যান, তবে সমাজের আসল দুঃখ যে কী—সে ধারণা তার কাছেও স্পষ্ট হবে না।

> "বৌদ্ধিক জগতে বিপরীত প্রচার চলছে। ফলে বিভেদও বাড়ছে। অসত্য ও অপপ্রচারের বন্যা বয়ে চলেছে সমাজে। তাই সত্যের প্রচার চাই জনগণের ঘরে ঘরে।"

আজ সমাজের মধ্যে গোষ্ঠীগত দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। তাই সামাজিক সমরসতার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি। সঙ্ঘের কাজের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমরসতার কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। আমাদের দেশের প্রতিটি প্রান্তের পরিস্থিতি ভিন্ন, প্রয়োজনও ভিন্ন। সামাজিক সমরসতার প্রয়াস প্রতিটি প্রান্তের পরিস্থিতি অনুযায়ী এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই কাজ প্রচার বা ভাষণের কাজ নয়, নেতাগিরিও নয়, চাপের কাছে কোনওপ্রকার নতিস্বীকারও নয়। উপকার, পুণ্য বা ধর্মের কাজও নয়। এটি সংস্কারের কাজ। কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করে তবেই এগিয়ে যাওয়া উচিত। তাই বলে এই কাজ কিন্তু নীরসও নয়। এইটি চিন্তাধারা বদলের কাজ। কোনও অপরাধবোধ নিয়ে বা কেবল অপরের ভুল সংশোধনের ভাবনা নিয়েও এই কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। হীনমন্যতা বা অহংকারবোধ নিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব

প্রতিষ্ঠার ব্যাপারই নয়। এই কাজে শুদ্ধ ভাবনা চাই যে আমরা সকলে একে অপরের বন্ধু। আমাদের মধ্যে একতা নির্মাণ করতে হবে। এইরকম স্পষ্ট ধারণা ও নির্মল মানসিকতা চাই এই কাজে। যারা আমাদের থেকে দূরে চলে গেছে তাদের জন্য তো কাজ করতেই হবে। এমনকী যাদের কারণে এরা দূরে চলে গেছে তাদেরও মানসিকতা পরিবর্তনের প্রয়াস নিতে হবে।

শ্রী গুরুজী বলতেন সকলের সাথে একাত্ম না হওয়া—উচ্চবর্ণের লোকেদের একটি মনের অসুখ। তাই ওদের মন থেকে এইসব ভাবনা দূর করে সমরসতার ভাবনা নির্মাণ করতে হবে। প্রচার, প্রসার, মোহ, মায়া বা প্রলোভন থেকে দূরে সরে গিয়ে এই কাজ করতে হয়। তিনভাবে এই কাজ হতে পারে। প্রথমে বৌদ্ধিক জগৎ পরে আচরণের পরিপ্রেক্ষিতের জগৎ এবং সবশেষে সমাজ। কোথাও কাজ করবার সময় যদি আমি নিজেকে ও আমার পরিবারের বাতাবরণের কথা মাথায় রাখি তবে কাজ করতে করতে আত্মীয়তার ভাবনা আসবে। ফলে এই সব কাজে সফলতা আসবে। এই সবই আমাদের আচরণের স্বাভাবিক ধারা হওয়া উচিত।

কেবল বন্ধুত্বের সম্পর্ক নয়, এই সম্পর্ককে পারিবারিক সম্পর্কে পরিণত করতে হবে। সামাজিক বা পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে একে অপরের বাড়িতে যাওয়া উচিত। আমি যদি যেতে না পারি তবে অন্যদের আমার বাড়িতে ডাকার উদ্যোগ নিতে হবে। সঙ্ঘের সকল কর্মকর্তা নিজেদের জীবনে এইসব সংকল্প হিসাবে গ্রহণ করুন।

বৌদ্ধিক জগতে বিপরীত প্রচার চলছে। ফলে বিভেদও বাড়ছে। অসত্য ও অপপ্রচারের বন্যা বয়ে চলেছে সমাজে। তাই সত্যের প্রচার চাই জনগণের ঘরে ঘরে। ড. আম্বেদকর এই চিন্তা নিয়েই কাজ করতেন। আমরা এই বিষয়টি জানলেও জনগণের কাছে এইসব বিষয় পরিষ্কার নয়। ড. আম্বেদকরের নেতিবাচক দিকগুলির কথাই মানুষ জানে, কিন্তু তাঁর ইতিবাচক ভূমিকার কথা বিশেষ কেউ জানে না। এইসব বিষয় যখন তাদের শোনানো হয় তখন তাদের কাছে এগুলি নতুন বলে মনে হয়। এইসব ঠিক করতে হলে ড. আম্বেদকর নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছেন তাদের জনগণের কাছে আলোকপাত করতে হবে। সাথে নিতে হবে সমাজ বিশেষজ্ঞদের। অসত্য প্রচারের প্রতিবাদ করে সমাজের প্রতিটি জাতি বর্ণের সমস্যা নিরসন করা বা তাদের দুঃখ নিবারণ করার প্রয়াসও চালাতে হবে। বুনিয়াদি তথ্য নিয়ে আমাদের যে জ্ঞান সেটি কার্যকর্তা বা সমাজের সকলের সামনে তুলে ধরতে হবে। সমাজ সংস্কারকদের এই বিষয়ে যে সব চিন্তাভাবনা আছে সেগুলি যদি তাঁরা তাঁদের নিজ ভাষাতেই জনগণের কাছে তুলে ধরেন, তবে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তাই এই ব্যাপারে যারা অধ্যয়ন করছেন তাঁদেরকে সামাজিক সমরসতার প্রবক্তা হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মহাপুরুষদের জন্মদিন, তিরোধান দিবস ইত্যাদি সকলে একসঙ্গে পালন করা উচিত। সামাজিক উৎসবেও চাই সহভোজের ব্যবস্থা। আমাদের সংগঠনের নানা কার্যক্রম, উপকার্যক্রম ও নীতিতে সামাজিক সমরসতার বিষয়টি যাতে সকলের কাছে স্পষ্ট হয়, সেটি দেখা প্রয়োজন। এই রকম বাতাবরণই আমাদের সংগঠনে নির্মাণ করতে হবে। নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ঘটনাও ঘটছে। এইসব আমরা কীভাবে প্রকাশ করব? যদি কোনও অত্যাচার হয় তার জবাবই-বা আমরা কীভাবে দেব? সত্য কথাই তো বলতে হবে। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু জটিল তাই সত্যকে কীভাবে প্রকাশ করব—সে কৌশল আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। ভাষার উপর সংযম তো চাই ই, নানাবিধ কঠিন পরীক্ষাও এইসময় আমাদের দিতে হবে। এতকাল ধরে যারা অত্যাচারিত হয়ে এসেছে সমাজে তাদের স্বীকৃতি তখনই মিলবে যখন আমরা এইসব কঠিন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারব। যদি ভয় পেয়ে যাই তবে কোনও কাজ হবে না, সমাজে আমাদের স্বীকৃতিও মিলবে না। সমরসতার ভাবনাও আসবে না। তাই এই কঠিন পরীক্ষার সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধৈর্যশীল হতে হবে। প্রথম থেকেই তো পিছিয়ে পড়া মানুষজনদের বলা হয়েছে যে তারা হিন্দু নয়, এমনকী রামের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ জাগানো হয়েছে। যেহেতু আমরা সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে চাই, তাই আমাদের সবই শুনতে হবে, সহ্যও করতে হবে। ভয় নেই, অসত্য কখনই টিকে থাকে না। কিন্তু সেটিকে দূরীভূত করা হবে কোন পথে—সেটিই আমাদের ঠিক করতে হবে। তাই আমাদের মাথা ঠাণ্ডা রেখে সামাজিক সমস্তরকম আচার আচরণে শামিল হতে হবে। আর যদি সামাজিক বিভেদ সৃষ্টি হয়ই তবে সহ্য না করে প্রতিবাদ করতে হবে। দেশের সর্বপ্রান্তে এই কাজই হওয়া উচিত।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক)

ভাষান্তর ঃ অমল বসু

নন্দীগ্রাম...ভালো আছো তো?

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

না। নন্দীগ্রাম ভালো নেই। কারণ নন্দীগ্রাম আজ রাজনৈতিক গবেষণাগারের গিনিপিগ। বৈজ্ঞানিকের ছুরি-কাঁচির কাটাছেঁড়ায় অসহায় গিনিপিগের যে অবস্থা— নন্দীগ্রামেরও তেমনি। একদিকে এক বৈশ্বিক সমাজবাদী সরকারের ৩৫ বছরের ভাতঘুম ভেঙে হঠাৎ শিল্পায়নের কল্পনাবিলাসের অদম্য প্রয়াস, আর একদিকে গরিব কৃষকের জমি বাঁচানোর নাটকের অন্তরালে মা-মাটি-মানুষের আন্দোলনের মাঝে এক কিংকর্তব্যবিমূঢ় নন্দীগ্রাম।

কিন্তু এখানেও বিড়ম্বনা। ৩৫ বছরের অবহেলা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু পরের দশটা বছর? একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগের শেষে যে মুখ্যমন্ত্রী নন্দীগ্রামকে তার 'ছোটো বোন' বলে বুকে টেনে নিয়েছেন— নির্বাচনের পরে তাঁর চোখ কেন অশ্রুসজল, অথবা গণতন্ত্রের এই যজ্ঞে যে নন্দীগ্রাম পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিরোধী দলনেতাকে উপহার দিয়েছে— সে কেন আজ দুঃখী-অসহায়! এ এক বিস্ময়কর প্রশ্ন।

২০২০ সাল থেকে পর পর দু'বছর করোনা মহামারীতে নন্দীগ্রামও মুমূর্ষু। বিগত ৪৫ বছরের কর্মনাশা রাজনীতি নন্দীগ্রামের অধিকাংশ যুবককে পরিযায়ী শ্রমিকে রূপান্তরিত করেছে। বাকিরা কেউ ঠিকা শ্রমিক, ক্ষুদ্র দোকানি অথবা চাষা— এতদিন এই ছিল নন্দীগ্রামের ভবিতব্য। কিন্তু করোনা এসে আজ কেড়ে নিয়েছে তাদের সেটুকু সম্বলকেও। গত বছর থেকে ঘরে ফেরা পরিযায়ীরা অধিকাংশই আজ কর্মহীন ও ঘরবন্দি। শ্রমিক, ব্যবসায়ী সকলেরই এক অবস্থা, কাজ নেই, টাকা নেই, শুধুই হতাশা।

তারপর এল পশ্চিমবঙ্গের সেই মহা সংগ্রাম— বিধানসভা নির্বাচন। দাদা-দিদির লড়াইয়ের অন্তিম দৃশ্যে ২ মে রাত্রি হতে শুরু হলো জেহাদি তাণ্ডব। নন্দীগ্রামের হিন্দুদের পাড়ায় পাড়ায় শুরু হলো আক্রমণ। বাড়ি ভাঙা, দোকান লুট, অগ্নিসংযোগ, মেয়েদের শ্লীলতাহানি— কী ছিল না সেই বহ্নোৎসবে। পরাজিত মুখ্যমন্ত্রী তার সাধের ছোটো বোনকে চুপিসাড়ে কখন যে কোল থেকে নামিয়ে পথে বসিয়ে দিয়ে চলে গেছেন বুঝতেই পারেনি নন্দীগ্রামের মানুষ। আর যখন বুঝল তখন সে দেখল নন্দীগ্রামের হিন্দু আর বাংলাদেশের হিন্দুর মধ্যে আজ আর কোনো পার্থক্য নেই। দুজনেই বড়ো অসহায়, জেহাদি জল্লাদের সহজ লক্ষ্যবস্তু।

ভাবছেন শেষ! না, এখানেই শেষ নয়। এরপর আর এক রাক্ষস— 'যশ'। তিন দিক নদী ও সমুদ্র দিয়ে ঘেরা নন্দীগ্রামের প্রায় ২০টি গ্রাম প্লাবিত করে যখন সেই উদ্দাম ঝড় থামল, তখন সেখানে শুধুই হাহাকার। চারিদিকে শুধু সব হারানোদের আর্তচিৎকার দাও— দাও— দাও—। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য! কিন্তু এতকিছু দুঃখ-কষ্টের মাঝেও আশার কথা, সেদিনের সে জেহাদি আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা নন্দীগ্রাম সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছে। গ্রামে গ্রামে হিন্দুরা আজ 'হিন্দু' নামে একত্রিত হয়েছে। এর কারণ— আরএসএস। আজ থেকে প্রায় ৪২ বছর আগে ১৯৭৯ সালে সঙ্ঘের যে চারাগাছটি নন্দীগ্রামের মাটিতে রোপিত হয়েছিল—তা আজ শাখা-প্রশাখা মেলেছে। নন্দীগ্রামের ১৭টি অঞ্চলের সবকটিতে আজ সঙ্ঘের কাজ দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। তাই আজ করোনার এই দুঃসময়ে, রাজনৈতিক হানাহানির মুহূর্তে অথবা 'যশ' তাণ্ডবের অব্যবহিত পরে সঙ্ঘ তার সমগ্র শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানুষের সেবায়। পাঁচ হাজারেরও বেশি অসহায় পরিবারকে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থায় সদাকর্মরত— Ready for Selfless Service (RSS)-এর স্বয়ংসেবকেরা।

এমনই সেবাকাজের একটি ছোট্ট ঘটনা দিয়ে শেষ করব এই লেখা। নন্দীগ্রামের একদম দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত জেলিংহাম নামে একটি সুমুদ্র সৈকত। ২৩ মে 'যশ'-এর ভয়াল তাণ্ডবে বাঁধ ভেঙে প্রায় ১০টি গ্রাম প্লাবিত হলো জলোচ্ছ্বাসে। গ্রামের হতদরিদ্র মানুষ শিশু, নারী, বৃদ্ধ, গবাদি পশু সবাইকে নিয়ে ঠাঁই নিল উঁচু রাস্তায়। মাথার ওপর ছাদ নেই, পেটে ভাত নেই, পানীয় জলও নেই, সেই সময় সঙ্ঘের বিভাগ পৌঁছালো সেখানে। শুকনো খাওয়ার, চাল, ডাল, তেল বিতরণ শুরু হলো। এরপর শুরু হলো ঘরে ফেরানোর পালা। বেশ কিছু ত্রিপলও এসে পৌঁছালো। একদিন ত্রিপল বিতরণের কাজ প্রায় শেষ, এমন সময় নারায়ণ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি প্রায় কেঁদে এসে পড়ল কার্যকর্তাদের কাছে— আমার ছাদটি উড়ে গেছে, একটিবার দেখবেন চলুন। কার্যকর্তারা গিয়ে দেখেন, ছোট্ট এককামরার একটি ইঁটের ঘর, সাতটি প্রাণীর বাস। টালির ছাদটি প্রায় ধুলিসাৎ। কমপক্ষে তিন চারটি ত্রিপল হলে তবেই ঢাকা যাবে। সব দেখে এক কার্যকর্তা বললেন— 'এখন আমাদের কাছে তো মাত্র দুটি ত্রিপল পড়ে আছে, এই দুটিই রাখো, আপাতত কাজ চালাও।'

নারায়ণ বললেন— 'মাত্র দুটি'? কার্যকর্তা বললেন— 'সব শেষ যে, আপাতত মাথাটুকু বাঁচুক'। কার্যকর্তার কথা শেষ করতে দিল না নারায়ণ— 'তবে শম্ভুর ঘরটা কি বাঁচবে না বাবু? কার্যকর্তা বলেন, 'শম্ভু কে?' 'আমার পড়শী, দিনমজুরি করে। ওর জন্য অন্তত একটা দিন। ওর খড়ের চালাটা একবার দেখুন।' কার্যকর্তা বললেন— 'কিন্তু আর যে একটাও আমাদের কাছে নেই। পরে এলে না হয়'..., নারায়ণ এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'তবে আমায় একটা দিন, আর শম্ভুকে একটা দিন। না হলে বৃষ্টি এলে বউ-বাচ্চা নিয়ে ও বড়ো বিপদে পড়বে।' নারায়ণের উত্তরে কার্যকর্তারা হতবাক। যার নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, সেই হতদরিদ্র মানুষটি তার প্রতিবেশীকে নিজের পাওয়া জিনিসের ভাগ দিয়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। কে বলে এটা স্বার্থপরতার যুগ?

ওই একটি একটি ত্রিপলে সেদিন হয়তো ঢাকেনি নারায়ণ ও শম্ভুর ঘরের চাল, কিন্তু ওদের একের প্রতি অন্যের ভালোবাসা ও সহমর্মিতা বাঁচিয়ে রেখেছে নন্দীগ্রামকে। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'— কবির এই বাণীকে পাথেয় করে আজও বেঁচে আছে দুঃখী নন্দীগ্রাম।

দুঃস্থ মানুষের পাশে বাঁকুড়া জেলার স্বয়ংসেবকরা

রাজদীপ মিশ্র

বাঁকুড়া নগরে করোনা রোগী ও তাদের পরিবারকে ১৭ মে ২০২১ থেকে ১৫ জুন ২০২১, ৩০ দিনে ২০০ পরিবারকে দুপুরে ১২৭০টি, রাতে ১০৫৪টি এবং ভবঘুরেদের ৪৭০টি মোট ২৭৯৪টি খাবারের প্যাকেট দেওয়া হয়েছে। ১২ জন রোগীকে অক্সিজেন, ১২ জন রোগীকে বিভিন্ন নার্সিং হোম ও হাসপাতালে ভর্তি করা, ৫ জন রোগীকে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, ৫ জনের মেডিসিন কিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মৌলাডাঙ্গা গ্রামে ১০০ সাপুড়ে পরিবারকে শুকনো খাবারের প্যাকেট দেওয়া হয়েছে। এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়েছে। ২০০০ স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুর নগরে ৫০টি দুঃস্থ পরিবারকে ফুড প্যাকেট (ডাল, নুন, তেল, সয়াবিন, বিস্কুট, সাবান, মাস্ক) বিতরণ করা হয়েছে। বেবি ফুড ও ফল বিতরণ ১টি দুঃস্থ পরিবারকে, ৬ জনকে টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে। নাগরিক সচেতনতার জন্য লিফলেট পোস্টারিং ও বিতরণ করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুর খণ্ডে দুটি গ্রামের মোট ৭৫টি পরিবারে ২০০ গ্রাম করে সরিষার তেল, ২০০ গ্রাম করে সোয়াবিন, ৩০০ গ্রাম করে মুসুরি ডাল, ৬টি করে ডিম ও একটি করে সাবান দেওয়া হয়েছে।

সারেঙ্গা খণ্ডে ত্রিপল ২৫টি, ওষুধ ১২ জনকে করোনা ওষুধ কিট এবং ৫ জন দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠ্যবই দেওয়া হয়েছে।

গঙ্গাজলঘাঁটি খণ্ডে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বই ও ত্রিপল বিতরণ করা হয়েছে। ইন্দপুরে ১৫টি ত্রিপল বিতরণ করা হয়েছে।

খাতড়া নগরে খাদ্য সামগ্রী প্যাকেট ৮০টি পরিবারকে, ত্রিপল ১০ পরিবারকে, কাপড় ১৫টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে।

বড়জোড়ায় সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়েছে। ৫০০ মাস্ক বিতরণ, বড়জোড়া হসপিটাল, বাজার ও পখন্না হসপিটাল স্যানিটাইজেশন করা হয়েছে।

দক্ষিণ দমদমে সেবাকাজ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নিত্য শাখা চালানো ছাড়া নৈমিত্তিক সেবাকাজ করে থাকে। করোনাকালে নিত্য কাজে বিচ্ছেদ পড়ায় নৈমিত্তিক সেবা কাজ নিত্যরূপ নিয়েছে।

সারা দেশের সঙ্গে সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত মাধব নগরে করোনার দ্বিতীয় ঢেউকে সামাল দেবার জন্য বিভিন্ন সেবা কাজ করা হয়। এই মিউনিসিপ্যালিটির পাঁচটি ওয়ার্ডে নিয়মিত স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

একই সময়ে ইয়াস ঝড়ের তাণ্ডবের ফলে বহু বস্তিবাড়ি ভেঙে পড়ে। এদের মধ্যে ত্রিপল বিলি করা হয়। লকডাউনের সময় মাধব নগরের অন্তর্গত শাখার উদ্যোগে করোনা আক্রান্ত ও তাদের পরিবারকে দু'বেলা খাবার সরবরাহ করা হয়। এছাড়া সমাজ সেবা ভারতীর উদ্যোগে কিছু ওষুধ সরবরাহ করা হয়। কয়েক জায়গায় অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের ব্যবস্থা করা হয়। সমাজের সাধারণ মানুষ স্বয়ংসেবকদের পাশে দাঁড়িয়ে অর্থ সহযোগিতা করেন।

করোনাকালে আন্দামান সেবা ভারতী

সেবা ভারতী পূর্বের মতো সমাজের দুর্বল শ্রেণী, বিশেষ করে জনজাতি, শহরের ফুটপাতবাসী ও উদ্বাস্তু পল্লিতে বিভিন্ন সেবা কাজ করে আসছে— চিকিৎসা, নিঃশুল্ক পাঠদান, বৃত্তিমূলক শিক্ষা। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সেবা ভারতীর নামেই প্রায় একশো প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত সেবা কাজ পৌঁছে দিয়েছে। সবসময় সেবা ভারতীর কার্যকর্তারাই সর্বপ্রথম পীড়িত মানুষের কাছে গিয়ে থাকে। করোনা মহামারীর দিনগুলিতেও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পীড়িত মানুষের কাছে তাঁরা পৌঁছেছেন। মধ্য আন্দামান জেলার একটি খণ্ড মায়াবন্দরে কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে সেবা ভারতী এরকম ৮৫টি পরিবারকে রেশন প্যাকেট তুলে দিয়েছে। যার মধ্যে বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী, অশীতিপর বৃদ্ধ ও দৈনিক মজুরিতে কাজ করা মানুষ আছেন। কোভিড-১৯- এর ভীতি কমানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যথেষ্ট প্রচার করা হয়েছে। ৯৯৮ জনকে টিকাকরণের জন্য নাম নথিভূক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা অনুযায়ী ৪৫০টি পরিবারের মধ্যে হোমিও ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। এই সমস্ত কাজে স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান পাওয়া গেছে। সেবা ভারতী ভবিষ্যতে আরও বেশি কাজ করার জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ।

সংকটকালে স্বয়ংসেবকদের একটাই সংকল্প : 'সেবা পরম ধর্ম'

ড. অনিল নিগম

আমরা দেখেছি যে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশব্যাপী হাহাকার রব উঠেছে। এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যখন করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা চার লক্ষের উপর পৌঁছেছে। দ্বিতীয় ঢেউ তো আসারই ছিল কিন্তু তার ভয়ানক প্রভাব সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবগত হতে কোথাও খামতি থেকে গেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়সেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত ১৫ মে একটি অনুষ্ঠানে বলেন যে, করোনা অতিমারীর প্রথম ঢেউয়ের পর সরকার, প্রশাসন ও জনতার অসাবধানতাতেই পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, মানবতার উপর সংকটের এমন কালো ছায়া থেকে মুক্তি কীভাবে পাওয়া যাবে? এই সময় একটি আপ্তবাক্যই মনে পড়ে, 'সেবা পরমো ধর্মঃ'। যদিও অনেক সামাজিক সংগঠন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সেবা কাজ করছে নিজ নিজ পদ্ধতিতে। এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, সেবা ভারতী ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ প্রভৃতি দ্বারা যে সেবা কাজ চলছে তা উল্লেখযোগ্য। আজ আবার একবার সঙ্ঘের স্বয়সেবকেরা নিজেদের জীবন সংকটে ফেলে আপ্তবাক্যটিকে চরিতার্থ করছেন। আমরা জানি যে করোনা ভাইরাস (মূলত চীনা ভাইরাস)-এর যাত্রা চীন থেকে শুরু হয়ে কিছু সময়ের মধ্যেই সারা বিশ্বের সংকটে পরিণত হয়েছে। এই ভাইরাস উন্নততর চিকিৎসা পদ্ধতির দেশ ব্রিটেন, জার্মানি, স্পেন ও ইতালির মতো ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে মহাশক্তিধর দেশ আমেরিকাতেও ধ্বংসলীলা শুরু করেছে। এখন ভারতেও সেই ধ্বংসাত্মক তাণ্ডব শুরু হয়েছে। গত বছরে যখন এই করোনা ভাইরাস ভারতে প্রাদুর্ভাব হয় তখন সেই সময়েও ভারত সরকারের সঙ্গে 'সঙ্ঘ' সব থেকে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। সরকারি কর্মচারীরা কর্তব্য পালনের জন্য বেতন পান কিন্তু স্বয়ংসেবকরা নিজেদের পকেট থেকে খরচ করে এবং নিজেদের শরীরস্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করে সেবা করে গেছেন।

আমাদের দেশে করোনার সংক্রমণ শুরু হওয়ার পরপরই ২৪ মার্চ ২০২০-তে সরকার সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছে। সঙ্ঘ ও তার সহযোগী সংগঠন সেবা ভারতী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তারা চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের নির্দেশগুলি মাথায় রেখে সংক্রামিত ও অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সঙ্ঘের ধ্যেয়বাক্য হলো— 'নর সেবাই নারায়ণ সেবা— ভারতমায়ের কোনো সন্তান যেন অভুক্ত না থাকে। সঙ্ঘ এই ধ্যেয়বাক্যকেই নিজেদের লক্ষ্য বানিয়ে কাজ করে চলেছে।

দেশে দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রকোপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ২৫০টি কোভিড হাসপাতালে প্রশাসনের সঙ্গে একযোগে কাজ করে চলেছেন। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ৫০টি শহরে কোভিড সেবা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এছাড়া সারা দেশে ২,৪৪২টি টিকাকরণ কেন্দ্র চালানো হচ্ছে। স্বয়ংসেবকরা দেশময় মানব সেবায় নিজেদের সমর্পণ করেছেন। সমর্থ ভারত অভিযানের অন্তর্গত মহারাষ্ট্রর পুনেতে নিঃশুল্ক 'কোভিড কেয়ার সেন্টার' শুরু করেছে। সঙ্ঘের উদ্যোগে উত্তর প্রদেশের নয়ডা, গাজিয়াবাদ, কানপুর, আগ্রা প্রভৃতি অনেক স্থানেই কোভিড হাসপাতাল, অক্সিজেন কেন্দ্র ও আইসোলেশন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের রেসকোর্স রোডে অবস্থিত লক্ষ্মীবাই রাষ্ট্রীয় শারীরিক শিক্ষা সংস্থার ইন্ডোর অডিটোরিয়ামে 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সেবা ভারতী কোভিড কেয়ার সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। ভোপালে সঙ্ঘের কার্যকর্তারা গান্ধীনগরের সেবা ভারতী আশ্রম, শিবাজী নগরে সরস্বতী শিশু মন্দির ও সরস্বতী শিশু মন্দির নারিয়েল খেড়া, সরস্বতী শিশু মন্দির কোটরায় কোরান্টাইন সেন্টার বানিয়েছেন। এই কেন্দ্রগুলিতে হাজার হাজার গরিব ও দুঃস্থ লোকেদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া কারোর যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য স্বয়ংসেবকরা উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মধ্য প্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, হরিয়ানা-সহ বিভিন্ন প্রদেশে করোনা আক্রান্ত পরিবারবর্গের জন্য হেল্পলাইন নম্বর শুরু করেছে। এই হেল্পলাইন নম্বরের মাধ্যমে হাসপাতালে বেড, খাবার, ওষুধ, অ্যাম্বুলেন্স, স্যানিটাইজেশন, প্লাজমা, রক্ত, চিকিৎসা পরামর্শের সঙ্গে আরও অনেক রকমের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এই মহামারীর সময় স্বয়ংসেবকরা প্রথম সারির যোদ্ধারূপে তৎপর রয়েছেন। এইভাবে স্বয়ংসেবকরা অভুক্তদের খাবার দেওয়া থেকে শুরু করে অন্তিম সংস্কার পর্যন্ত করছে। যেখানে করোনা সংক্রামিত রোগীর মৃত্যু হলে তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবারের মানুষ এগিয়ে আসছে না, সেখানে স্বয়ংসেবকরা এই সব কাজ করছে।

১৯১৮ সালের পর থেকে মানব সভ্যতার সবথেকে বড়ো সংকট হলো করোনা ভাইরাস। ১৯১৮-তে স্প্যানিস ফ্লু নামক মহামারী এসেছিল। এই মহামারীর ভয়াবহতা আমরা এই বিষয় থেকে জানতে পারি যে, ১৯২১-এ জনগণনাতে আমরা দেখেছি ১৯১১-র অপেক্ষায় জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। করোনা অতিমারীর কারণে আজ আরও একবার মানবতা সংকটের মুখে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে লড়াই করার দায়িত্ব শুধু প্রশাসনের নয়, সমগ্র মানব জাতিকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যেভাবে এই কাজ্যের জন্য নিজেদের সমর্পণ করেছে, তাদেরকে কোটি কোটি প্রণাম। ◻

ফঃ ৫

সেবার দ্বারা নিজের চিত্তশুদ্ধি হয়

ড. তিলক রঞ্জন বেরা

সেবা যদি ধর্ম হয় তাহলে মনুষ্য জীবনে যা কিছু ধারণা তার মধ্যে সেবা অন্যতম। কিন্তু মনুষ্য সমাজে সেবা নিয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অন্যরকম। সবাই ভাবে কারও সেবা করলাম— অর্থাৎ তার উপকার করলাম। এমনকী আমাদের খাবারের উচ্ছিষ্ট পশুপাখিকে দিলেও মনটা আনন্দিত হয়। ভাবলাম ওদের খেতে দিলাম। কিন্তু তা নয়, বরং ওগুলো ফেলে দিলে পরিবেশ নোংরা হতো তার থেকে বাঁচলাম। অর্থাৎ ওরাই আমাদের পরিবেশ রক্ষা করল। আমাদের ছোটোবেলায় জামাকাপড়ের বা অন্য ব্যবহার্য জিনিসের প্রাচুর্য কম ছিল। কিন্তু আজকাল একটা মধ্যবিত্ত পরিবারেও ছেলে-মেয়েদের জামাকাপড়ের প্রাচুর্য আছে— কিন্তু কউকে দেওয়ার মানসিকতা কম। বরং বিপরীত দেখা যায়— যাদের বেশি আছে তারাই আরও চায়।

সেবার ক্ষেত্রে ধনী দরিদ্র প্রসঙ্গ নয়, বিষয় হলো মানসিকতা, অভ্যাস। একটা অতি দরিদ্র পরিবারেও খাওয়ার সময় অতিথি এলে তাকে খাবারের অংশ সাগ্রহে দেওয়া হয়। সঙ্ঘের শাখায় আসার ফলে আমাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বভাব জাগ্রত হয়েছে, স্বাভাবিকভাবে আমরা ছোটো থেকেই কিছু না কিছু ভাবতে শিখেছি। অপরকে দিয়ে খাব, ভাগ করে খাব— এটা আমাদের শৈশবের শিক্ষা।

সেবা যদি ধর্মই হয়— তাহলে তা দৈনন্দিন কর্তব্য বা দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। আমার বাবা অসুস্থ হলে দেখাশুনা করলাম— তা যদি কর্তব্য হয় তাহলে প্রতিবেশী কেউ অসুস্থ হলে সেবা করব না কেন? সেবাকে আলাদা করে দেখাটাই ভুল। ব্যক্তি থেকে পরিবার, তার থেকে সমাজ— এই যদি পরিধি হয় তাহলে চিন্তার ছেদ থাকে না। সেই পরিধি বৃদ্ধি করাটাই অভ্যাস বা অনুশীলন। সেবার অভ্যাস শুধু যে কোনো সংগঠনের মাধ্যমে তা নয়, বরং পরিবারে পিতা-মাতার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। অনেক পরিবারে শিশুর হাত দিয়ে ভিখারিকে কিছু দেওয়ার রীতি আছে। মন্দিরে গিয়ে মা শিশুর হাত দিয়ে পয়সা দিয়ে প্রণাম করতে বলে। এমনকী পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদির প্রতি ভালোবাসাও সেবা। বাড়িতেও কোনো ভারী কাজ বাবা নিজে করেন, ছেলেকে করতে দেন না— ছেলের কষ্ট হবে, আবার ছেলে উলটো ভাবছে যে বাবার কষ্ট হবে। এখান থেকেই পারস্পরিক ভাবনা জাগ্রত হয়। পিতা-মাতা না খেয়ে অনেক কষ্ট করেও ছেলে-মেয়েকে বড়ো করার চেষ্টা করে। তাই ছেলে-মেয়ে বড়ো হয়ে মা-বাবাকে দেখবে— এটাই কর্তব্য। সেজন্য সেবা ও কর্তব্য সমার্থক।

শ্রীগুরুজীকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল— জীবনের অর্থ কী? তিনি উত্তরে বললেন— 'আমি নয়, তুমিই' পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেছেন— 'খিদে পেলে খাওয়া প্রকৃতি, অন্যের খাবার কেড়ে খাওয়া বিকৃতি, নিজের খাবার অন্যের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়া হলো সংস্কৃতি।' মোক্ষ যদি জীবনের লক্ষ্য হয় তাহলে জগৎ কল্যাণে সেবার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। সকলের মধ্যে একই ঈশ্বর বিরাজমান— এই উপলব্ধির জন্য চাই নিরন্তর সাধনা। এর দ্বারাই নিঃস্বার্থ ভাব ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়। ভারতবর্ষের সেবাভাবের মধ্যে আছে আধ্যাত্মিক চেতনা। এখানে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র— ভাবনা জাগানো হয়। সেবা কাজে চিত্তশুদ্ধি হয়, আর তার থেকে হৃদয় বড়ো হয়। স্বামীজীর কথায়— 'প্রসারণই জীবন, সংকোচনই মৃত্যু।' সঙ্ঘের

শাখার মধ্য দিয়েই স্বয়ংসেবকদের মধ্যে সেবার ভাব জাগে। কয়েকবছর আগে প্রবল বর্ষণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে প্লাবন হয়েছিল, অন্যান্য জেলার সঙ্গে কাঁথি শহরের লাগোয়া গ্রামগুলিও প্লাবিত হয়েছিল। পাঁচ-ছয় দিন প্রায় দশ ফুট জল দাঁড়িয়ে থাকার ফলে কাঁচা মাটির ঘরবাড়ি সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গ্রামবাসীরা বিদ্যালয় ভবনে বা গ্রামের খালপাড়ে তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছিল। কলকাতা থেকে ত্রাণ হিসেবে আসা শুকনো চিড়ে ও অন্যান্য খাবার, গুড়, মোমবাতি অল্প ওষুধপত্র সকলকে বিলি করা হয়েছিল। বিলি করার দায়িত্ব স্থানীয় শাখার বালক ও তরুণদের উপর পড়েছিল। এক বালক স্বয়ংসেবক ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র, সকলের সঙ্গে সেও বাড়ি বাড়ি ঘুরে আনন্দের সঙ্গে বিলি করছিল। সে নিজে জানে— তাদের বাড়িতেও দু'-তিন দিন ঠিকমতো খাবার জোটেনি, কিন্তু একবারও মুখ ফুটে অন্য বন্ধুদের নিজের বাড়ির কথা বলতে পারেনি। এই হলো প্রকৃত সংস্কৃতিবান স্বয়ংসেবক।

এখান থেকেই দেশসেবক তৈরি হয়, সকলের সঙ্গে কাজ করতে পারে, দেশের জন্য আত্মবলিদান করতে শেখে। সেবার অর্থ হলো সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করা। দত্তাপন্ত ঠেংড়ীজীর জীবনের ঘটনা মনে পড়ছে। ১৯৫২ সালের কথা। সঙ্ঘের নির্দেশে তাঁকে শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হলো। কিন্তু স্বয়ংসেবকদের এই কাজের অভিজ্ঞতা নেই। তাই প্রথমে কংগ্রেসের শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে কাজ শিখতে গেলেন। প্রায় দু'বছর কাজ করার পর অনেকের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছে। তাই সকলের সহযোগিতায় একটা ছোটো ইউনিটের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেছেন। মনে একটু আনন্দও হয়েছে। সেই খবরটা শ্রীগুরুজীকে দিতে গেলেন, শ্রীগুরুজী একটু পিঠ চাপড়ালেন কিন্তু তারপরেই প্রশ্ন করলেন— তোমার ইউনিটের সদস্য সংখ্যা কত? তুমি কতজনকে ব্যক্তিগত ভাবে চেন? ইত্যাদি প্রশ্ন করে বোঝালেন যে, তুমি যতজনের প্রতিনিধি প্রত্যেকের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত কিনা?

সেবার কাজ করতে গেলে শিক্ষার প্রয়োজন, ভাবনা প্রয়োজন। কোথায় কাজ করবো? কীভাবে করবো? কিছু চাঁদা জোগাড় করলাম। দু'-চারজন মিলে একটা হোমিও চিকিৎসাকেন্দ্র খুলে দিলাম— সেবা হয়ে গেল, তা নয়। ১৯৮৫ সালে মেদিনীপুর শহরে সরস্বতী শিশু মন্দির তৈরি হওয়ার পর একটি সেবা প্রকল্প উদ্‌বোধনে এসেছিলেন অমল কুমার বসু (তখনকার পূর্বাঞ্চল সভাপতি, বিদ্যাভারতী)। তিনি তাঁর স্বল্প ভাষণে বললেন— সেবা প্রকল্প চালাতে গেলে আগে পাশাপাশি যত পাড়া আছে— সবার বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। কাদের কী অভাব আছে— জিজ্ঞাসা করতে হবে। সেবা গ্রহীতাদের নামের তালিকা করতে হবে। তারপর সেই অনুযায়ী প্রকল্প শুরু করতে হবে। তবেই প্রকল্প জনহিতকর হবে। সেবা প্রকল্প চালাতে গেলে সবসময় লোকবল বা অর্থবল দরকার হয় না। অর্থাৎ সেবা করছি— এই ভাব আলাদা করে না ভাবাই ভালো। দৈনন্দিন চলার পথে বিভিন্ন ভাবে মানুষের কাজে সহযোগিতা করাই মূল উদ্দেশ্য। একা একাও করা যায়। তাদের সঙ্গে কথা বলে মনের ব্যথা দূর করা যায়। অনেক বয়স্ক লোক আছেন, তাঁরা কথা বলতে চান, গল্প করতে চান, বাইরের খবর জানতে চান, আজকাল মোবাইল ফোনের ব্যবহার জানতে চান ইত্যাদি অনেক রকম মানসিক সমস্যা দূর করা যায়, অপরকে আনন্দ দেওয়া যায়। সবমিলিয়ে আমাদের ভাবতে হবে, যেভাবে হোক পরস্পরের মনকে স্পর্শ করতে হবে। অপরের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হতে হবে। বর্তমানকালে অর্থের সমস্যা নেই বললেই চলে, মানসিক সমস্যাই বেশি। তাই যথাসম্ভব খোঁজখবর করে, সদা জাগ্রত থেকে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজের পাশে দাঁড়ানোর নামই সেবা। ■

আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে মালদার স্বয়ংসেবকরাও সদা তৎপর

দীপঙ্কর কমল বর্মা

অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের আবেদন ফর্ম থেকে নাম্বারটা দেখে ফোন করলাম মালদা শহরের এক করোনায় আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে। ওপাশে মধ্যবয়স্কা মহিলা ফোন ধরলেন। আমি নিজের পরিচয় দিয়ে রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি ও কনসেনট্রেটরের খবর জানতে চাইতেই মহিলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমি তো হতভম্ব। কিন্তু উনি কাঁদতে কাঁদতেই যা বললেন তার সারমর্ম এই যে, সেদিন যদি সঙ্ঘ (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ) তাঁদের পাশে না দাঁড়াতো বা স্বয়ংসেবকরা তাঁর বাড়িতে ওই অক্সিজেন তৈরির মেশিনটি পৌঁছে না দিত তাহলে আর ওই রাতে তাঁর স্বামীকে হয়তো বাঁচানোই যেত না। তার সঙ্গে তিনি অজস্রবার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলেন। আমি মনে মনে ভাবছিলাম এই প্রশংসা বা স্তুতি কার প্রাপ্য, আমাদের তো নয়ই হয়তো সেবা ভারতী বা অন্য কোনও সংগঠনেরও নয়। এর অধিকারী শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যিনি আমাদের ভারতমায়ের সন্তান বানিয়ে এইরূপ আদর্শের মাধ্যমে তারই আরও সন্তানদের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছেন।

এইরকম অজস্র সেবা কাজ মালদা জেলা-সহ পুরো উত্তরবঙ্গ জুড়ে হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মোট ১৪টি (সাংগঠনিক) জেলায় ২২ প্রকারের সেবা কাজের মাধ্যমে প্রায় ১২০০ জন স্বয়ংসেবক মিলে ৮০০ স্থানে প্রায় ৫০০০০ মানুষকে সেবা দিয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অক্সিজেন পরিষেবা (সিলিন্ডার ও কনসেনট্রেটর), রক্তদান, টিকাকরণে সহযোগিতা, অনলাইন ডাক্তারি পরামর্শ, ওষুধ (অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক) বিতরণ, মাস্ক ও খাবারের প্যাকেট (রান্না করা ও শুকনো) বিলি, স্যানিটাইজেশন, অ্যাম্বুলেন্স ও শববাহন পরিষেবা, শবদাহ ইত্যাদি। করোনার দ্বিতীয় পর্যায়ের ঢেউ চলাকালীন সঙ্ঘের এই বিপুল সেবা কাজ সিকিম, দার্জিলিং-সহ পুরো উত্তরবঙ্গের জনমানসে সঙ্ঘের প্রতি এক আলাদা শ্রদ্ধার জায়গা তৈরি করে দিয়েছে।

সমাজ সেবা ভারতী প্রান্তিক মানুষের আশ্রয়স্থল

রিপন দাস

যদি লক্ষ্য থাকে অটুট, বিশ্বাস থাকে হৃদয়ে, তবে নিশ্চয় পরিবর্তন আসবে সমাজে। দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষে বিভেদ ও বিঘটন সৃষ্টিকারী অপশক্তি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। দেশের অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত কোটি কোটি মানুষের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদেশিরা সমাজকে বিপথে পরিচালনা করে চলেছে। বিপথগামী এই সমাজকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন আমাদের অফুরন্ত ইচ্ছাশক্তি, একাত্মভাব, সমতা এবং সকলের জন্য প্রেম ও স্নেহ। সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের অংশ বিদ্যমান এই মূল ভাবনাকে পাথেয় করে এবং জীবসেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা— স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীকে শুধু আউড়ে গেলে হবে না, কাজেও করে দেখাতে হবে। অর্থনৈতিক ভাবে সমাজের দুর্বল অংশগুলিতে বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক, উপজাতি এবং বনবাসী সমাজের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য অংশের মধ্যে মিল বন্ধন-সহ একটি উন্নত রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বনবাসী, গিরিবাসী ও শহরাঞ্চলের সেবা বস্তিতে গিয়ে সহায়তা এবং দরিদ্র মানুষকে আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বী করার কাজ নিরলসভাবে করে যেতে হবে। সেদিনই সমাজ কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে। আত্মবৎ সর্বভূতেষু— এই ভাবনা নিয়ে এবং সমাজের বঞ্চিত প্রান্তিক মানুষের সেবাকে পাখির চোখ করে সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের যাত্রা এবং একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট। সেবার দ্বারা প্রান্তিক মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের মাধ্যমে এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মানুষের আর্থিক উন্নতির জন্য সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজ সেবা ভারতীর সদস্যরা প্রচুর পরিশ্রম করে চলেছে। গত দু' দশক ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে সমাজ সেবা ভারতীর সেবা প্রকল্প যা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় চলমান। পশ্চিমবঙ্গে সমাজ সেবা ভারতীর সেবা কাজকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, স্থায়ীভাবে নিরন্তর সেবা কাজ এবং দ্বিতীয়ত, নৈমিত্তক সেবা কাজ।

মাতৃমণ্ডলীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা :

একটি রাষ্ট্রকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে হলে মাতৃমণ্ডলীর ভূমিকা অপরিসীম, তাই সমাজের মধ্যে ভেদাভেদকে উপেক্ষা করে সমাজ সেবা ভারতী মাতৃমণ্ডলীর জন্য উৎসাহ কেন্দ্র, শিক্ষা কেন্দ্র, সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিউটিশিয়ান শিক্ষা কেন্দ্র, হস্ত শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদির মাধ্যমে মাতৃমণ্ডলীর উত্থানে সমাজের আমূল পরিবর্তনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট।

শিক্ষা ক্ষেত্রে :

শিক্ষাই হলো জাতির মেরুদণ্ড, তাই শিক্ষকে প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শিক্ষা উপক্রম ও কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ সেবা ভারতী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিশু সংস্কার কেন্দ্র, অঙ্কন শিক্ষা কেন্দ্র, নিঃশুল্ক কোচিং সেন্টার, শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ, আর্থিকভাবে দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা, পুস্তক প্রদান, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী অনলাইন প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রী যেন এগিয়ে যেতে পারে সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে সমাজ সেবা ভারতী।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে :

স্বাস্থ্য হলো শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা। সমাজের প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য সকল নাগরিকের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আশেপাশের এলাকার জঞ্জাল পরিষ্কারের পাশাপাশি একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস এবং আত্মবল বৃদ্ধি করবে এটাই কাম্য। পরিবেশ-বান্ধব জীবনযাত্রার উপায় সম্পর্কে সচেতনতা, জ্ঞান, প্রতিশ্রুতি এবং তাদের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষকে বর্জ্য, জল ব্যবস্থাপনা, পলিথিন ব্যবহারের কুফল, পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার উপায় এবং এক বৃক্ষ প্রশিক্ষণ ও সম্যক ধারণা প্রদানের মাধ্যমে সমাজকে সুস্থ ও সুন্দর করে তোলার জন্য সমাজ সেবা ভারতী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বনৌষধী বা আয়ুর্বেদ শাস্ত্র :

সমাজ সেবা ভারতী শুধু প্রকল্প বা পরিকল্পনায় থেমে থাকে না বরং তৎবিষয়ক প্রশিক্ষণ, কার্যক্রম এবং পরিণামকারী সেবা কাজে বিশ্বাসী যা সমাজকে সত্যিকারের ইতিবাচক পরিবর্তনে বিশ্বাসী। মহামারী করোনা আমাদের সর্বস্বান্ত করেই চলেছে এমতাবস্থায় ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসরণের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যের জন্য বনৌষধীর উপর পূর্ণবিশ্বাস আনার জন্য সচেষ্ট হতে সমাজ সেবা ভারতী ও আয়ুশ যৌথ উদ্যোগে আয়ুশ ৬৪ বিতরণ এবং ভিন্ন রোগের জন্য কারা তৈরি ও বিতরণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষায় অনবরত সেবা কাজ করে চলেছে।

স্বনির্ভর গ্রাম প্রকল্প :

আজ আমাদের নিজস্ব করোনা টিকা ব্যবহৃত হচ্ছে। ধীরে ধীরে রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে। এ ধারাকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং দেশবাসীকে একটি সুস্থ ও আত্মনির্ভর ভারত উপহার দেওয়ার জন্য সময়োপযোগী যোজনা নিয়ে প্রান্তিক মানুষের সেবায় এগিয়ে যেতে হবে। গ্রাম উন্নত হলে দেশ উন্নত হবে। তাই সমাজ সেবা ভারতী স্বনির্ভর গ্রাম তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বনির্ভর প্রকল্পের যোজনা হাতে নিয়েছে।

জীবনে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্য স্বনির্ভর হওয়ার থেকে আর কোনও বড়ো উপায় নেই। তবে, স্বনির্ভর হবো বললেই তো আর স্বনির্ভর হওয়া যায় না। অসাধ্যও অবশ্যই নয়। উপযুক্ত ও সৎ পরিকল্পনা থাকা চাই। সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে একবিংশ শতাব্দী ভারতের হবে, এজন্য আরও দৃঢ় সংকল্প নিতে হবে। সমাজ সেবা ভারতী তাই স্বনির্ভর গ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে জৈবিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, মায়েদের এবং পুরুষদের জন্য স্বনির্ভরতার হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন- বিপননের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি, গ্রাম ভিত্তিক ক্ষুদ্রশিল্প গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, গোমাতার রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পগুলো যাতে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা যায় তার জন্য বিভিন্ন যোজনাও করেছে।

আমফান ও সমাজ সেবা ভারতী :

সামুদ্রিক ঘূর্ণি ঝড় আমফানের প্রভাবে গত বছর (২০২০) মে-জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৮টি জেলায় জনজীবন ভীষণভবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাজার হাজার মানুষের ঘরবাড়ি সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় জমির ফসল, উপকূল এলাকায় সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে নষ্ট হয়ে যায় চাষের জমিও। এমতাবস্থায় সমাজসেবা ভারতী তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে দুর্গত এই মানুষগুলির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের অপরিসীম দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য যথাসাধ্যভাবে সেবা কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা, বাড়ির আচ্ছাদনের ত্রিপল, বাসনপত্র, দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী-সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

করোনা ভাইরাস এ সমাজ সেবা ভারতীর সেবা কাজ :

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণে সারা দেশের জনজীবন স্তব্ধপ্রায়। এই বিপর্যয়ে পশ্চিমবঙ্গ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় অগ্রাধিকার হিসেবে সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গ স্থানীয় জনগণের সহায়তায় এবং এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সারা বাঙ্গলার প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের হাতে খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, পানীয়, ওষুধপথ্যাদি পৌঁছে দিয়ে চলেছে। পাশাপাশি কোভিড আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কলকাতা-সহ সারা রাজ্যে কোভিড কেয়ার সেন্টার, আইসোলেশন সেন্টার, অক্সিজেন সহায়তা কেন্দ্র, শ্রমিক সেবা কেন্দ্র, আয়ুর্বেদিক কারা বিতরণ, শবদাহ সেবা ইত্যাদি সেবা প্রদান চালু করেছে।

ইয়াস সেবা কাজ ২০২১ :

ঘূর্ণিঝড় ইয়াস উপকূলীয় অঞ্চলের গ্রামগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কয়েক লক্ষ মানুষ তদের বাড়িঘর হারিয়েছে। হারিয়েছে তাদের প্রতিদিনের আয়ের উৎস। এই বেকায়দায় পড়ে থাকা এবং অসহায় মানুষের পাশে সমাজ সেবা ভারতীর সদস্যরা সময়মতো দুর্গতদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ৬টি জেলায় কয়েকশো গ্রামের প্রায় ১.৫০ কোটি মানুষ ঘূর্ণিঝড় ইয়াস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় লক্ষ পরিবারকে সহায়তা স্বরূপ ১০ হাজার ত্রিপল, ৬৩ হাজার শুকনো খাবারের প্যাকেট, প্রায় দেড় লক্ষ লোককে তৈরি করা খাদ্য বিতরণ করা হয়, ১৪ হাজার প্যাকেট ব্লিচিং পাউডার, ৫ হাজার বই এবং অধ্যয়নের উপকরণ কিট, স্বনির্ভরতার জন্য ৫০০ পরিবারকে সহায়তা প্রশিক্ষণ/অন্যান্য সাহায্য, ১০০টি স্থানে মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা, ১০০ গ্রামে মন্দির, কমিউনিটি হল এবং অডিটোরিয়াম নির্মাণে সহায়তা, ১ হাজার পরিবারকে পশুপালনের জন্য সহায়তা, ৫০০০ পরিবারকে নারকেল গাছ এবং ফলের গাছ বিতরণ, ৫০০ পরিবারকে ঘর নির্মাণ সামগ্রী সহায়তা, ৫০০ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা এবং ২০ হাজার ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে।

সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ আজ প্রান্তিক মানুষের শুধু আশ্রয়স্থলই নয়, ভরসার স্থানও বটে। সকলের সহযোগিতায় দেশের সংস্কৃতি, পরম্পরার নবজাগরণ সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে বৈভবশলী ভারতবর্ষ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। ◻

আয়লা-ফনি-আমফান-যশ সুন্দরবনবাসীকে সর্বস্বান্ত করেছে

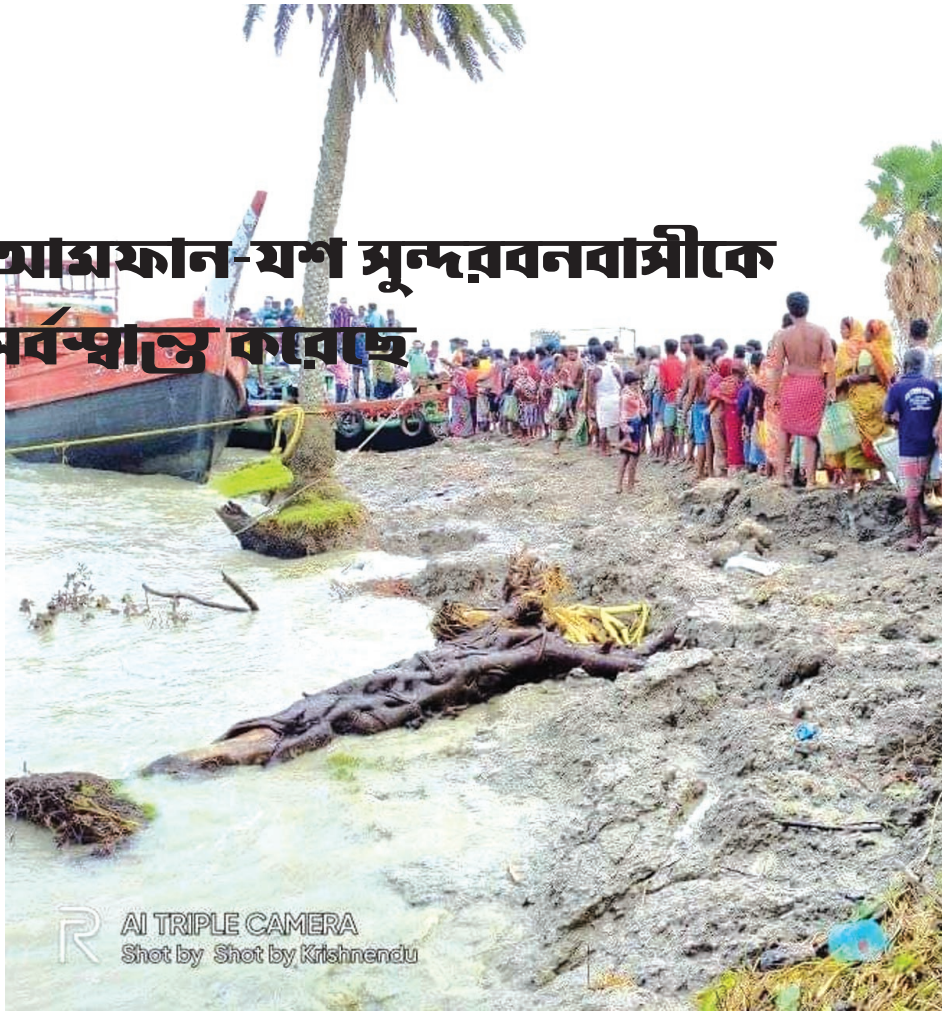

সৈকত মণ্ডল

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহনায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল সুন্দরবন। সুন্দরী হেঁতাল, গরানে সমৃদ্ধ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লবনাম্বু উদ্ভিদসমূহ সুন্দরবনকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরিয়ে রেখেছে। বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের নিরাপদ আবাসস্থল, কুমির কাঁকড়ার জলাভূমি, দোয়েল, কোয়েল-সহ পরিযায়ী পাখির মুক্তভূমি সুন্দরবন দেশ-বিদেশের ভ্রমণ পিপাসুদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্র। স্বাধীনোত্তোর ভারতে সুন্দরবনের আয়তন ৯,৬৩০ বর্গকিলোমিটার। রায়মঙ্গল, কলাগাছিয়া, মাতলা, গোমর, পিয়ালী-সহ অসংখ্য ছোটো বড়ো নদী দিয়ে ঘেরা দ্বীপের সমষ্টি এই সুন্দরবন। সুন্দরবনের মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২টি। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং-১, ক্যানিং-২, কুলতলী, জয়নগর-১, জয়নগর-২, মথুরাপুর-১, মথুরাপুর-২, নামখানা, সাগর, কাকদ্বীপ ও পাথরপ্রতিমা—এই ১৩টি ব্লকের ৩৮টি দ্বীপ এবং উত্তর ২৪ পরগনা হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি-১, সন্দেশখালি-২, হাসনাবাদ, হাড়োয়া, মিনাখাঁ—এই ৬টি ব্লকের ১৬টি দ্বীপ অর্থাৎ মোট ৫৪টি দ্বীপে মানুষ বসবাস করে। বাকি ৪৮টি দ্বীপে ম্যানগ্রোভ বনভূমি। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে সুপারিভাঙা ও লোহাচরা দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়েছে এবং ঘোড়ামারা দ্বীপও প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে।

বর্তমানে সুন্দরবনে প্রায় ১৮ লক্ষের বেশি মানুষ বসবাস করছে। এর মধ্যে ৬০ শতাংশ তফশিলি পৌণ্ড্র, নমঃশূদ্র জেলে, বাগদি, কৈবর্ত্য, কাওরা, চর্মকার প্রভৃতি অনুসূচিত জাতিভুক্ত। ৩৫ শতাংশের কাছাকাছি মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যার একটা বৃহদংশ অনুপ্রবেশকারী ও ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান, বাকি অংশ অপেক্ষাকৃত ধনী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এখানকার শতকরা ৮০-৮৫ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজ ও মাছ, কাঁকড়া শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং ১০ শতাংশ মানুষ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। ২০০১-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী সুন্দরবনে কৃষি জমির পরিমাণ ছিল ৩,১০.৫৬১ হেক্টর। গত এক দশকের ব্যবধানে অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবারের ক্ষুদ্রায়তন এবং প্রায় প্রতিবছর নদী ভাঙনের কারণে ক্রমহ্রাসমান কৃষিজমির পরিমাণ ২.৫ লক্ষ হেক্টরের মধ্যে ঠেকেছে।

নদীঘেরা দ্বীপবেষ্টিত সুন্দরবনে ছোটো-মাঝারি-বড়ো কোনও শিল্প-কারখানা গড়ে না ওঠায়, বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় সেখানকার মানুষের জীবিকা অর্জনের প্রধান ও একমাত্র উপায় কৃষিকাজ। কিন্তু সেখানেও বিধি বাম। কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় হলো জোয়ার-ভাঁটার নোনাজল। ৩৫০০ কিলোমিটার মাটির দুর্বল বাঁধ কোনোরকমে মনুষ্য বসতির ৫৩৬৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা বাঁচিয়ে রেখেছে। একদিকে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি। অন্যদিকে নদীর নাব্যতা হ্রাস, ফলে জল ধারণের আয়তন কমে যাচ্ছে। প্রায় প্রতিবছর কখনও বাঁধ ভেঙে অথবা বাঁধ উপছে নদীর জল চাষের জমি প্লাবিত করছে। যার ফলে মাটিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুন্দরবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষকে সারা বিশ্বে গৌরবান্বিত করেছে। সেই সুন্দরবন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে একাধিকবার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সর্বস্বান্ত হয়েছেন সুন্দরবনের লক্ষ লক্ষ মানুষ। ১৯৮৮-এর ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়, ১৯৯১-এর নোনাবন্যা ও ঘূর্ণিঝড়, ১৯৯৫-এর নোনাবন্যা, প্রবল জলোচ্ছ্বাস ও বৃষ্টিবন্যা, ২০০৬-এ একাধিকবার নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কিংবা ২০০৭-এর সিডার সুন্দরবনের মানুষকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করালেও ২০০৯-এর ঘূর্ণিঝড় আয়লা সুন্দরবনবাসীকে সর্বস্বান্ত করেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন গোসাবা, বাসন্তী, পাথরপ্রতিমা, কুলতলী, সন্দেশখালি-১৩২ এবং হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের মানুষ। এই ৭টি ব্লকে ১০-১২ ঘণ্টার তাণ্ডবে ৭৭৮ কিলোমিটার বাঁধ ভেঙে কুমিরমারী, রায়মঙ্গল, হেমনগর, আতাপুর, গাঁড়াল নদী, লাহিড়ীপুর মিলেমিশে একাকার। প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়। প্রকৃতির রোষানলে সুন্দরবনের নারী-পুরুষ, কিশোর-যুবক সকলেরই রোজগারের ঠিকানা হলো গুজরাট, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র। আর যারা নিজের জন্মভূমি, নিজের সদ্যোজাত সন্তান, বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেড়ে ভিনরাজ্যে যেতে পারলেন না, তাঁদের ঠিকানা হলো কলকাতা শহর ও শহরতলি। তৎকালীন কেন্দ্র সরকার সুন্দরবনের মাটির দুর্বল বাঁধগুলি কংক্রিট বাঁধে উন্নীত করতে ব্যাপক আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করে। রাজনীতির লাভ-ক্ষতিতে সেই বাঁধ নির্মাণের

কাজ আজও শুরু হয়নি। ফলে আয়লার ক্ষত সেরে ওঠার আগেই ২০১৩-তে ফাইলিন, ২০১৪-তে হুদহুদ, ২০১৯-এর ফনির মতো ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলা করেছে সুন্দরবনবাসী, সারা বিশ্বের মতো সুন্দরবনবাসীর কাছে অভিশপ্ত বছর ২০২০। যখন গোটা পৃথিবী করোনা মহামারীতে দিশেহারা, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের অনির্দিষ্টকালীন লকডাউন চলছে। ভিনরাজ্য থেকে এক প্রকার বিতাড়িত সদ্য কাজ হারানো সুন্দরবনের মানুষ 'পরিযায়ী' শ্রমিকের তকমা নিয়ে ঘরে ফিরে কোনওরকমে দিনযাপন করছে, ঠিক তখনই 'আমফান' ঘূর্ণিঝড় আয়লার স্মৃতি স্মরণ করিয়ে সুন্দরবনের গোসাবা, কুলতলী, হিঙ্গলগঞ্জ-সহ একাধিক ব্লক নোনাজলে প্লাবিত হলো। প্রায় ৩২ হাজার কাঁচাবাড়ি বানের জলে ভেসে গেল। ফলে সমাজিক দূরত্ব বিধি ভুলে শুধু জীবন রক্ষার তাগিদে বানভাসী মানুষগুলোর আশ্রয় হলো গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কিংবা নদীর পাড়ে ত্রিপলের কুঁড়ে ঘরে। যথারীতি কেন্দ্র সরকারের পর্যবেক্ষক দল এবং স্বয়ং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন, বরাদ্দও হলো হাজার হাজার কোটি টাকা। কিন্তু নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস, সরকারি অর্থ বণ্টনে প্রাধান্য পেল রাজনৈতিক দলের পরিচয়। ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষগুলো বঞ্চিত হলো। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই করোনার দ্বিতীয় ঢেউ, চারিদিকে মৃত্যুমিছিল। তার পর সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক হিংসার কারণে সুন্দরবন কার্যত পুরুষশূন্য। অধিকাংশ অঞ্চলের মানুষ ঘরছাড়া। ঠিক তখনই 'যশ'সাইক্লোনের প্রভাবে অস্বাভাবিক নদীর জলোচ্ছ্বাসে কোথাও বাঁধ ভেঙে, কোথাও বাঁধ উপছে আবারও প্লাবিত গোসাবা, সোনাগাঁ, রাঙাবেলিয়া, কুমিরমারী, কচুখালি, তারানগর, কুলতলীর দেউলবাড়ি, ভুবনেশ্বরী, সাগরের ঘোড়ামারা দ্বীপ, কচুবেড়িয়া-সহ একাধিক এলাকা। আয়লা থেকে আমফান হয়ে যশ— সুন্দরবনের ছবিটা একটুও পালটালো না। বন্যার জলে সব হারানো মানুষের হাহাকার। শহুরে বাবুদের ত্রাণের অপেক্ষায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব বয়সী মানুষের আর্তনাদ, নদীর তীর বরাবর জলে দাঁড়িয়ে কামট-কুমিরের ভয় উপেক্ষা করে একটা পানীয় জলের বোতলের জন্য চিৎকার। সামাজিক সংগঠনগুলির ত্রাণ নিয়ে তাদের পাশে পৌঁছবার প্রয়াস। আমফানের অভিজ্ঞতা থেকে 'যশ' ঘূর্ণিঝড়ের পরদিনই সঙ্ঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজ সেবা ভারতী ও তফশিলি উত্থানের স্বয়ংসেবকরা বন্যা পীড়িত মানুষের পাশে থেকে সবরকমের সহযোগিতা করেছে। এই দুই সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় কুলতলী ব্লকের চার জায়গায় ১০টি, রায়দিঘীতে ২ জায়গায় ২টি এবং সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকা গোসাবা ব্লকের কুমিরমারী দ্বীপে ২টি, কচুখালি দ্বীপে, ৪টি তারানগর দ্বীপে ১টি ও ছোটো মোল্লাখালি দ্বীপে ১টি সেবা শিবিরে প্রতিদিন প্রায় ৬০০০-এর বেশি মানুষের মধ্যাহ্নকালীন আহার এবং চিড়ে, গুড়, মুড়ি, বাতাসা, ওআরএস-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এলাকা স্বচ্ছতার জন্য পর্যাপ্ত চুন ও ব্লিচিং দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নর্থ ক্যালকাটা লায়ন্স ক্লাব ও মুক্তির সহযোগিতায় বন্যাকবলিত কুমিরমারী, কচুখালি, রাঙাবেলিয়া, উত্তরডাঙ্গা, সোনাগাঁও দুলকীতে পরিশ্রুত পানীয় জলের ট্রাঙ্ক, কুলতলিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়েছে। জ্বালাবেড়িয়া হিন্দুস্কুলে কোভিড কেয়ার ইউনিট, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর করা হয়েছে। বন্যা প্লাবিত এলাকা বিশেষত গোসাবা ব্লকের মানুষ যাতে গোমাতার খাবারের অভাবে গোমাতা বিক্রি করে না দেন, সেই কারণে নোনা জলে ডুবে থাকা প্রত্যেকটি দ্বীপে গো-খাদ্য বণ্টন করা হয়েছে ২০০ জন কৃষকের হাতে নেপিয়ার ঘাসের দানা বিতরণ করা হয়েছে। লবণাক্ত পরিবেশে এই ঘাস কীভাবে উৎপাদন করা হয়, সেই বিষয়ে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের উদ্যোগে যশবিধ্বস্ত সাগরদ্বীপের কচুবেড়িয়াতে ২০০-র অধিক মৎস্যজীবী পরিবারের হাতে রান্নার সামগ্রী খবার দেওয়া হয়েছে। কুলতলী, পাথরপ্রতিমা ও নামখানাতে ৩০০-র অধিক শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও জেলার একাধিক ব্লকে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি গোসাবা ব্লকে স্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্প, সমাজের পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেধাবী ছেলে-মেয়েদের 'কেরিয়ার কাউন্সিলিং' বালবিধবা মাতৃশক্তি ও নৌকাডুবিতে মৃত মৎস্যজীবী পরিবারের মাতৃশক্তিদের আত্মনির্ভরতার প্রশিক্ষণ-সহ একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ভাঙাগড়ার এই সুন্দরবনকে যদি রক্ষা করতেই হয়, তাহলে সুন্দরবনের মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিতেই হবে। অন্যান্য বন্যার সময়ে তারা ত্রাণে সন্তুষ্ট হলেও এই প্রথম তারা পরিত্রাণ চাইছে। সুন্দরবনের মানুষের দাবি :

(১) উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৬টি ব্লক, যার একাংশ বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৩টি ব্লক অর্থাৎ সুন্দরবনের মোট ১৯টি ব্লক সুন্দরবনকে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল করা হোক।

(২) ৩৫০০ হাজার মাটি দুর্বল বাঁধের পরিবর্তে কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ করা হোক।

(৩) ৫৪টি দ্বীপকে ক্রমশ ব্রিজের মাধ্যমে সংযুক্ত করে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ স্থাপন করে ছোটো-মাঝারী শিল্প গড়ে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হোক।

(৪) একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা এবং সেখানে অ্যাগ্রিকালচার, ফিসি কালচার, ফুড প্রসেসিং-সহ সুন্দরবনের ছেলে-মেয়েদের উপযোগী পাঠক্রম চালু করা।

(৫) শহর থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হওয়ায় প্রত্যেক ব্লকে অত্যাধুনিক হাসপাতাল এবং প্রতি অঞ্চলে প্রসূতি মায়েদের জন্য চাইল্ড কেয়ার ইউনিট তৈরি করা।

(৬) প্রতি বছর লক্ষাধিক ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ রোপণ করা।

অতিমারীতে হাওড়ার সেবা কাজ

ভুবনেশ্বরী দেবী

ভয়ংকর প্রাণঘাতী অতিমারী করোনা ভাইরাসের আক্রমণ ও 'যশ'-নামক সর্বনাশী ঝড়ের পরে গৃহবন্দি হয়ে থাকা জড়তা কাটানোর জন্য ভয়ে ভয়ে আমাদের পাশের বড়ো পার্কটিতে হাঁটতে বেরিয়েছি। রাস্তাঘাটে তত বেশি লোক দেখা যাচ্ছে না। পার্কে ঢুকে দেখলাম, এতো বড়ো ময়দান মাত্র কয়েকজন হাঁটছে। কেউ কারোর সঙ্গে সেরকম কথা বলছে না। মনে হলো, পার্কটি দীর্ঘদিনের একাকিত্ব কাটানোর জন্য বোধহয় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মহামারী করোনা ও যশের পরেও পার্কটিকে স্বচ্ছ দেখা যাচ্ছে। আমি ভাবলাম আমার মতো কয়েকজন চারিদিকের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বেরিয়েছে। একটু এগোতেই শুনতে পেলাম, 'ভারতমাতা কী জয়'। এত বড়ো পার্কের একদিকে ভিজে থাকা মাঠে খাঁকি হাফপ্যান্ট পরা কয়েকজন ছোটো-বড়ো ছেলে মনের আনন্দে নিজেদের কাজ মনে করে পার্কটিকে পরিষ্কার করছে। একটি গেরুয়া পতাকা পতপত করে উড়ছে। পাশে জুতোগুলি লাইন করে সুন্দরভাবে সাজানো। ভিজে হলেও জায়গাটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলাম— এত বড়ো পার্কে সামাজিক দূরত্ব, অতিমারীর নিয়ম বিধি মেনে হৃদয় স্পর্শ করা নির্ভীক ও নিঃস্বার্থ 'সকলে আমরা সকলের তরে, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এই ভাবে স্বয়ংসেবকরা কাজে মগ্ন। স্থানটির আকর্ষণে আমার মন আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে সকলে গৈরিক পতাকার সামনে সামাজিক দূরত্ব মেনে গোল হয়ে বসে 'জনসেবা যে কর্ম আমাদের, ধর্ম আমাদের মানবতা, শোষিত, পীড়িত, বঞ্চিত মানুষের ভাগ্য গড়বো মোরা দিলাম কথা'— এই গানটি গাইল। গানের কথার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়স্পর্শী সুর যেন আমাকে মোহিত করল। একটি সংস্কৃত শ্লোকের পরে, পরিচয়ে বুঝলাম— কোনো বিশেষ ব্যক্তি উ পস্থিত আছেন। অতিমারী করোনা ও যশের পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের সেবাকাজ নিয়ে তারা আলোচনা করল। করোনা শুরু হওয়ার প্রথম থেকে বিভিন্ন স্তরের একাধিক সেবা টিম বানিয়ে একবারে নীচের স্তর পর্যন্ত প্রাণের মায়া না করে স্বয়ংসেবকরা সেবাকাজ করেছে। পুরো শহর জুড়ে কয়েক হাজার মাস্ক বিতরণ, কাড়া বিতরণ, ২২টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ও ১৭টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, বিভিন্ন স্থানে স্যানিটাইজার স্প্রে ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা, বাড়িতে বাড়িতে বাজার-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দেওয়া, বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকশো করোনা পীড়িত পরিবারে রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়া, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা, সরাসরি রক্তদান করা ও দুটি রক্তদান শিবির করা, ৫৪ জন ডাক্তার দ্বারা টেলিমেডিসিন চিকিৎসা ও প্রত্যক্ষ বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা, আয়ুষ-৬৪-র আয়ুর্বেদিক ওষুধের ব্যবহার, লকডাউনে রেশন কার্ড যাদের নেই এরকম একাধিক পরিবারকে রেশন বিতরণ, অ্যাম্বুলেন্স ও শববাহী গাড়ির ব্যবস্থা, চারটি ভ্যাকসিন সেন্টার তৈরি করে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থায় সহযোগিতা করা, ২টি স্থানে হোম কোয়ারেন্টাইন-এর ব্যবস্থা, লকডাউনের কারণে চাকরি ছেড়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বনির্ভর করার জন্য কিছু কাজ দেওয়া, আর্থিকভাবে কিছু পরিবারের পাশে দাঁড়ানো, সারা দেশের সঙ্গে পুরো হাওড়া জুড়ে স্বয়ংসেবকরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নিঃস্বার্থ সেবা কাজে সর্বদা রত আছেন।

যশের ফলে প্রাণ নাশক ঝড় না হলেও হাওড়ার হলদি নদীর জল বেড়ে জলোচ্ছ্বাস ও অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। কয়েকদিন ধরে চারটি স্থানে তিনশোর বেশি পরিবারের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়া সঙ্ঘের শাখার বিভিন্ন স্থান থেকে স্বয়ংসেবকরা শুকনো খাবার ও রান্না করা খাবার পরিবেশন করেছেন। ত্রিপল, চিড়া, গুড়, চাল, ডাল, আলু, তেল, লবণ হলুদ, পানীয় জল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস প্যাকেট করে পরিবেশন করেন। বাইশটি বিশেষ পিছিয়ে পড়া সেবা বস্তিতে বিভিন্ন প্রকার সেবা কাজ করেছে। বন্যাপীড়িত মানুষদের কাছে দাঁড়ানোর জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও দীঘা এলাকাতে স্বয়ংসেবকরা ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে এসেছেন। সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বয়ংসেবকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিঃস্বার্থ সেবা কাজ করেছে, যার প্রেরণা স্বয়ংসেবকরা শাখা থেকেই পেয়েছে। আমি তন্ময় হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে হাওড়ায় স্বয়ংসেবকদের সেবাকাজের বিবরণ শুনছিলাম। এটাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। পত্রপত্রিকা, টিভিতে না জানা গেলেও আমি চাক্ষুষ করলাম। মনে হলো সঙ্ঘকে আমাদের সমাজের জন্য ভগবানই পাঠিয়েছেন। আমাদের দেশে একটি সংগঠনের স্বয়ংসেবকরা প্রাণের ভয় না করে, কোনো প্রচার না করে নীরবে, নিঃশর্ত, নির্ভীক ভাবে সমাজের সেবাকাজ করে চলেছে। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সঙ্ঘের সেবা কাজ দেখে প্রিয় সংগঠন হিসেবে আমার জীবনকে সঙ্ঘের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে দিলাম।

অস্পৃশ্যতা যদি দোষের না হয় তবে পৃথিবীতে দোষ বলে কিছু নেই : বালাসাহেব দেওরস

বর্তমান বছরে 'বসন্ত ব্যাখ্যানমালা' ভাষণ দেওয়ার জন্য আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ করে যে গৌরব প্রদান করেছেন এবং নিজের মত ব্যক্ত করার অবসর দিয়েছেন, তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ।

এখানকার আয়োজকরা আমাকে কয়েকটি বিষয় চয়ন করার জন্য বলেছিলেন, তার মধ্যে 'সমাজিক সমতা ও হিন্দু সংগঠন'—এই বিষয়টি চয়ন করেছি। কারণ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ এবং হিন্দু সংগঠনের দৃষ্টিতে এই বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য হিন্দু সংগঠন অনিবার্য। সুতরাং এই সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে সামাজিক সমতার বিষয়টি স্পর্শকাতর ও সময়োপযোগী হওয়ার কারণে আমার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।

হিন্দু কে? হিন্দু শব্দের ব্যাখ্যা কী? এর উপর অনেক বার অনেক বিতর্ক খাড়া করা হয়েছে। সেই অনুভব আমাদের আছে। হিন্দু শব্দের অনেক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাই পরিপূর্ণ নয়। কারণ সব ব্যাখ্যার মধ্যে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষ আছে। সর্বমান্য ব্যাখ্যা নেই। শুধু এই কারণে হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাবে কি? আমি মনে করি, হিন্দু সমাজ আছে এবং এর অন্তর্গত কোন্ কোন্ সমাজ, সেই সম্পর্কে সমস্ত মানুষের সর্বমান্য ধারণা আছে, যা অনেক বার অনেক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু বছর পূর্বে সরকার 'হিন্দু কোড' তৈরি করেছে। এক্ষেত্রে পণ্ডিত নেহরু ও ড. আম্বেদকর অগ্রণী ছিলেন। দেশের বহুসংখ্যক মানুষের জন্য যে বিধি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে তাকে প্রাথমিক ভাবে 'হিন্দু কোড' নাম দেওয়া হয়েছে এবং এই বিধি কাদের ক্ষেত্রে লাগু হবে একথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে মুসলমান, খৃষ্টান, পারসি ও ইহুদি ছাড়া বাকি সবলোক অর্থাৎ সনাতনী, আর্যসমাজী, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরবর্তীকালে এটাও বলা হয়েছে যে এই সমস্ত সমাজের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেউ যদি মনে করেন যে এই বিধি তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তবে তাঁকেই সেটা প্রমাণ করতে হবে।

তাঁদের মাথায় এই চিন্তা এল কেন? তাঁদের মনে হয়েছে যে ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত দিক থেকে সব বন্ধুদের জন্য সর্বসমাবেশক শব্দ 'হিন্দু'। তাই 'হিন্দু' শব্দ উচ্চারণ করলেই এই সব লোককেই বোঝায়, এই কথা মাথায় রেখেই আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করব।

আমরা সমস্ত হিন্দুকে সংগঠিত করতে চাই। সংগঠন মানে বাহিনী বা সভা নয়। সভায় লোক একত্রিত হয়, সংগঠনেও লোক একত্রিত হয়। ভালো কথায় বললে সংগঠনে মানুষকে একত্রিত আনতে হয়। একজায়গায় আসার পর মিলেমিশে কীভাবে থাকবে, কেন থাকবে তার চিন্তা করতে হয়। এই একতার ভিত্তি কী হতে পারে?

> "হিন্দু সমাজের কোনো শ্রেণীকে অন্যায় বা অত্যাচারের প্রতিভূ মনে করে অপমান করা, মনে ব্যথা দেওয়া ও হতোদ্যম করা কখনও ঠিক নয়। তাদের মনোবল ঠিক রেখে, নতুন রকমের সামাজিক ব্যবহারের উদাহরণ বা আদর্শ সামনে রাখা আবশ্যক। বস্তুত, সবাই হিন্দু সমাজেরই অঙ্গ।"

এই দেশ আমাদের মাতৃভূমি। আমরা তাঁর পুত্র। হাজার হাজার বছর ধরে এক সঙ্গে বসবাস করছি। এই দীর্ঘ কালখণ্ডে আমরা অতীতের উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছি। এর ভিত্তি ভাবাত্মক, কিন্তু এটাই কি পর্যাপ্ত? এই ভাবনার সঙ্গে কোনো ব্যবহারিক অংশ থাকা আবশ্যক? সব মানুষের মধ্যে 'আমরা সব এক' এই বোধ থাকা যেমন আবশ্যক, সেইরকম প্রত্যক্ষ ব্যবহারে একতার অনুভব সর্বদা সহজভাবে হওয়া প্রয়োজন। নিজেদের দৈনন্দিন ব্যবহারে যতক্ষণ পর্যন্ত 'একতা'র অনুভব না আসছে, ততক্ষণ একতার ভিত্তি মজবুত ও চিরস্থায়ী হতে পারে না। যদি আপনারা এইরকম ভাবেন এবং আমার বিশ্বাস আপনারা এইভাবেই ভাবছেন, তাহলে আমাদের ঘাটতি কোথায়— তার বিচার করা আবশ্যক।

বিগত অনেক শতাব্দী ধরে মুষ্টিমেয় মুসলমান ও ইংরেজ এই দেশ শাসন করেছে। আমাদের অনেক বন্ধুকে ধর্মান্তরিত করেছে। আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, সবর্ণ-অস্পৃশ্য ভেদ সৃষ্টি করেছে। এই ব্যাপারে আমরা ওই সমস্ত লোকদের দোষ দিয়েই দায়িত্ব মুক্ত হতে পারি না। বিদেশি শাসনকালে তাদের বুদ্ধিভেদের জন্যই হয়েছে— কেবল এরূপ ভাবলেই কি হবে? অন্য সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে আজ নয় কাল সম্পর্ক হবেই। বার্লিনে যে নকল প্রাচীর দেওয়া হয়েছিল— তা হওয়ার কথা ছিল না। প্রাচীর তো সেই দেয়, যে অপরের চিন্তা ও দর্শনকে ভয় পায়। দুটি পদ্ধতি একসঙ্গে চলার মধ্যেই শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পায়। যে পদ্ধতি ভয়ের কারণে নিজের চারদিকে প্রাচীর খাড়া করে সে তো নিজের হীনতা স্বীকার করে নেয়। সুতরাং অন্য লোকদের দোষারোপ করার চেয়ে অন্তর্মুখী হয়ে নিজেদের কোন্ দোষের জন্য তারা লাভ উঠিয়েছে তার বিচার করতে হবে। এরজন্য সামাজিক বিষমতাও কারণ— তা স্বীকার করতে

হবে। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা—এগুলি সামাজিক বিষমতার ফল। আজও সমাজে বিচরণ করার সময় এই সমস্ত প্রশ্ন আমাদের ধাক্কা দেয়— আমাদের সকলেরই এই অনুভব আছে।

আমরা আমাদের সংস্কৃতির প্রতি খুবই গর্বিত— যা অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। আমাদের আশা, সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজ নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি স্বাভিমানী হোক। আমরা বিশ্বাস করি— হিন্দুকে যদি সত্যিকারের হিন্দু হয়ে বাঁচতে হয় তাহলে নিজেদের সংস্কৃতির শাশ্বত মূল্যবোধগুলি যা দীর্ঘকাল ধরে বহু আঘাত ও ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক উথাল পাথালের মধ্যেও টিকে আছে, সেই পরম্পরাকে ছাড়লে চলবে না। এটা চিন্তা করা খুবই উচিত। কিন্তু তার অর্থ এই নয়— যা পুরনো তাই সোনা, তা অপরিবর্তনীয় ও শান্তশুদ্ধ।

'পুরাণমিত্যের ন সাধু সর্বম্'—অর্থাৎ যা পুরনো তাই ভালো, এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। এরকম ভাবাও ঠিক নয়— যে কথা আমরা এতদিন ধরে বলে আসছি, আজ নতুনভাবে ভাববার দরকার কী? 'তাতস্য কুপোঽয়মিতি বরুবাণাঃ ক্ষারং জলম্ কাপুরুষাঃ পিবন্তি' অর্থাৎ এই কুয়ো আমার বাবার, তার জল নোনতা তো কী হয়েছে। উনি তো এই জলই সারাজীবন খেয়েছেন, কিছুতো খারাপ হয়নি। সুতরাং আমরাও ওই জলই পান করব এইরকম দুরাগ্রহ থাকা ঠিক নয়। কিন্তু সমাজে অনেক প্রকার লোক থাকে। একশ্রেণীর লোক নতুন মতকে স্বীকার করতে প্রস্তুত আবার অন্য শ্রেণীর লোকেরা পুরনো ধারণাকে ধরে রাখতে চায়। 'পরীক্ষান্যতরৎ ভজন্তে'— এরকম বিচার করে অর্থাৎ কষ্টিপাথরে যাচাই করে বিবেক ও বুদ্ধির দ্বারা কোনো বস্তু ত্যাগ অথবা গ্রহণ কারাই উচিত হবে— এরূপ মানসিকতা অধিক প্রয়োজন। অধিকাংশ লোক এই পদ্ধতিতে ভাবনা ও ব্যবহার করতে প্রস্তুত হোক— সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।

আমার জানা আছে যে ইহুদিরা নির্দিষ্ট কালখণ্ডের পরে বার বার নিজেদের ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মীয় আচার বিচার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে, পুনর্মূল্যায়ন করেছে। ধর্মগ্রন্থে শব্দ বদল করা সম্ভব নয়। কিন্তু তারা নতুন ব্যাখ্যা তৈরি করেছে (Interpretation)। প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও এই প্রকার ধর্মচিন্তন, ধর্মমন্থন করা হোত। তাঁরা এটাও বিচার করে থাকবেন যে আমাদের ধর্মের কোন অংশ শাশ্বত ও কোন অংশটি পরিবর্তনশীল। নাহলে এতগুলি স্মৃতিগ্রন্থ তৈরি হতে পারত না। দেবতাদের মধ্যেও পরিবর্তন হয়েছে। ঋক্‌বেদের ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার জায়গায় বিষ্ণু ও শিবের উপাসনা চালু হয়েছে। শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে শত্রুতাপূর্ণ ব্যবহার ছিল কিন্তু আদি শঙ্করাচার্য সমন্বয় স্থাপিত করে পঞ্চায়তন পূজা প্রচলন করেন। এখন তো ঘরে ঘরে শিবরাত্রির সঙ্গে শয়ন ও প্রবোধিনী একাদশী ব্রত পালন করা হয়। প্রাচীন গ্রন্থ বা পুরাণে যে সমস্ত গল্পগাথা বর্ণিত রয়েছে তা আমরা হুবহু মানতে রাজি নয়। পুরাণে চন্দ্রগ্রহণের গল্প আছে। রাহু চাঁদকে গিলে নেয়, তাই চন্দ্রে গ্রহণ লাগে। সুতরাং পাঠশালায় চন্দ্রগ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা কি এই গল্পের অবতারণা করি? এমন কথা নেই যে কট্টরবাদী বা ধর্মগ্রন্থে লিখিত শব্দ অনুসারে বিশ্বাস ও আস্থা রাখার মতো লোক আমাদের দেশে বহু আছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাতে একটি মজার মামলা হয়েছিল (Readers' Digest-July 1962)। ওখানকার একটি রাজ্যে কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। তার উপর অভিযোগ ছিল যে বাইবেলে সৃষ্টি ও মনুষ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে গল্প আছে তার বিরুদ্ধে তিনি বিবর্তন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাকে শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে খৃষ্টান লোকেরা বাইবেলে বর্ণিত ওই গল্পের অমান্য করছে। কিন্তু তারা বাইবেলকে অশ্রদ্ধা করছে না। একথা অবশ্য মনে রাখার মতো। অনেক বিষয় ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন— এইরকম কিছু লোক মানেন। তা অপরিবর্তনীয় একথা সবাইকে বোঝানো তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই বলেছেন— 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'। ধর্মের গ্লানির পর ধর্মস্থাপনা করার অর্থ এটাতো নয় যে— পুরনো জিনিসকে নতুন করে চালু করা, সেখানে কোনো পরিবর্তন হবে না। শেষ পয়গম্বরের কথায়— 'আমিই শেষ অবতার'— এরকম তো কেউ বলেনি। প্রাণতত্ত্ব তো পুরনো হবেই, কারণ তা শাশ্বত ও সনাতন। কিন্তু তার অনুভব ও অভিব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে। এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানানো উচিত।

প্রাচীনকালে যে ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল তা সমসাময়িক কালের আবশ্যকতা অনুসারে হয়েছিল বলে আমার মনে হয়। আজ যদি তার প্রয়োজন না থাকে, তার উপযোগিতা সমাপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের ত্যাগ করা উচিত। যদি আমাদের বর্ণব্যবস্থার কথাই ধরি তাহলে দেখব যে সমাজে চার প্রকার কাজ সমাজ রচনার জন্য প্রয়োজন— এটা ভেবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যক্তিসমূহের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি দেখে এই ব্যবস্থা নির্মাণ হয়েছিল। ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণী বিভাগ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তার মধ্যে ভেদাভেদের কল্পনা কখনই ছিল না। কিছু বিদ্বান লোকের মতে শুরুতে বর্ণব্যবস্থা জন্মগত ছিল না। পরবর্তীকালে এই বিশালদেশে ও জনসমুদায়ে ব্যক্তি গুণমানকে কীভাবে চেনা যায় তা বিচারবান মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে। কোনো বিশিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতির অভাবের কারণে জন্ম থেকেই বর্ণব্যবস্থা স্বীকার করা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু তার মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদভাব ছিল না। বরং এই ব্যবস্থা 'সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ'রূপী বিরাট সমাজের অবয়ব— এরকম উদাত্ত কল্পনা এর পিছনে রয়েছে। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে ব্যবস্থার মধ্যে পায়ের চেয়ে জঙ্ঘা শ্রেষ্ঠ, জঙ্ঘার চেয়ে হাত, বা হাতের চেয়ে মাথা শ্রেষ্ঠ— এই প্রকার বিপরীত ও হাস্যাস্পদ ভাবনা কখনও ছিল না। এই কারণে একসময় এই ব্যবস্থা সর্বমান্য ছিল ও কিছুকাল পর্যন্ত সুচারু রূপে চলেছিল। এরজন্য কিছু checks ও balances -এর ব্যবস্থা ছিল। জ্ঞান-শক্তিকে পৃথক করা হয়েছিল। তাকে সম্মান দেওয়া হয়েছিল, সঙ্গে দারিদ্র্যও দিয়েছিল। দণ্ডশক্তিকে পৃথক করা হয়েছিল। এবং ধনশক্তি থেকে দূরে রেখেছিল। ধনশক্তিকে দণ্ডশক্তির সঙ্গে মিলতে দেয়নি। এইরকম যতক্ষণ check and balance ঠিকমতো চলেছে ততদিন এই ব্যবস্থা সুচারু রূপে চলেছে। পরে এইদিকে দুর্লক্ষ্য হওয়ার জন্য বা অন্য কারণে এই ব্যবস্থা ভেঙে গিয়েছে।

মানুষ জন্ম থেকে বা বংশানুক্রমিকভাবে গুণসম্পন্ন হয়— এই ভাবনা পূর্বপুরুষদের ছিল। সেই সময় তাঁরা জন্মগত গুণের মর্যাদা বুঝেছিলেন। তাই 'শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান ব্রাহ্মণো ভবেৎ। ব্রাহ্মণোঽপি ক্রীয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরো ভবেৎ'— এরকম বলেছেন বা 'জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ'—জন্ম থেকেই ব্রাহ্মণ হয়, এটা বলা ঠিক নয় বলে উদাহরণ দেওয়া যায়— ঋষ্যশৃঙ্গ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য প্রমুখ অন্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করেও ধর্মাচরণের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছেন।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে শূদ্রমাতার পুত্র মহীদাস নিজ গুণে দ্বিজ হয়েছেন এবং 'ঐতরেয়' ব্রাহ্মণের রচনা করেছেন। পিতৃপরিচয়হীন জাবালার উপনয়ন সংস্কার করে তাঁর গুরু তাঁকে দ্বিজ বানিয়েছেন— উপনিষদে এই গল্প প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন পদ্ধতিতে আবশ্যক নমনীয়তার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু বর্তমানে অনেক কারণে পরিস্থিতি পুরোপুরি বদল হয়েছে। তাই নতুন কাল বা নতুন যুগ অনুসারে বিচার করা উচিত। মুদ্রণ ব্যবস্থার জন্য পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষালয়ে জ্ঞান অর্জন শুরু হয়েছে। যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য কুটীর শিল্পের কাজ কারখানাতে হচ্ছে। নতুন আবিষ্কার হয়েছে। নতুন বিজ্ঞানের যুগ এসেছে। এই কারণে বংশানুক্রমিকতার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও অন্য বিষয়ের গুরুত্ব বেড়ে গেছে।

একথা ঠিক যে প্রাকৃতিক কারণে বা বংশপরম্পরার কারণে কিছু বিষমতা তৈরি হয়। কিন্তু বিষমতাকে নিয়ম বানানো ঠিক নয়। প্রকৃতি দ্বারা তৈরি বিষমতাকে মানুষ যদি স্থায়ী করার চেষ্টা করে তো সেটা কোনো মহানতার কাজ নয়। তাই মানুষকে প্রকৃতির নিয়ম অধ্যয়ন করে বিচার করে দেখতে হবে, প্রাকৃতিক বিষমতা কীভাবে দূর করা যায়, কীভাবে মানুষের সহনীয় করে তোলা যায়। বিষমতা সবার সামনে প্রচার করানো উচিত নয়। দুর্বল অথবা গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করা শিশুকে সবরকম সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা বিশ্বের সব উন্নত সমাজ করে থাকে। যদি কোনো বিশেষ জাতির পরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণে ন্যূনতা এসে থাকে তাহলে এই ব্যবস্থা টিকবে না। ওই ন্যূনতাকে বংশানুক্রমিক বা প্রাকৃতিক বলে সমর্থন করলে আজকের দিনে ভুল হবে। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণের বা অন্য ব্যবস্থার দ্বারা বংশপরম্পরায় চলে আসা গুণ বদলে দেওয়া যায়। জাপানের লোকেরা বেঁটে হয়, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার মানুষের সঙ্গে মেলামেশার কারণে জাপানিদের চলাফেরা ও খাদ্যাভ্যাসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এতে তাদের গড় উচ্চতাও বেড়ে গেছে। একথা সর্বজনবিদিত। প্রথমে নিজের দেশে বা অন্যদেশে কিছু জাতিকে মার্শাল বলার রীতি ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এত ব্যাপক আকারে হয়েছিল যে সম্পূর্ণ সৈনিকীকরণ অথবা সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করেই বড় বড় সেনাদল খাড়া করতে হয়েছিল এবং আমরা জানি এরা সবাই সত্যিকারের সৈন্যের মতোই যুদ্ধ করেছিল।

বাস্তবে যদি দেখি আজকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সমাজকে টিকে রাখার জন্য আবশ্যক জন্মগত বর্ণব্যবস্থা অথবা জাতি-ব্যবস্থার আজ কোনো অস্তিত্ব নেই। সর্বত্র অব্যবস্থা, বিকৃতি দেখা যাচ্ছে। আজ এই ব্যবস্থা কেবল বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত সীমিত। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নেই, কেবল কঙ্কাল পড়ে আছে। ভাব চলে গেছে, কাঠামো পড়ে আছে। প্রাণ বেরিয়ে গেছে, হাড়গোড় পড়ে আছে। সমাজ ধারণের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। সুতরাং সকলে মিলে বিবেচনা করতে হবে— যা সমাপ্ত হওয়া উচিত, যা নিজে থেকেই হচ্ছে, তা যেন ঠিক পদ্ধতিতে সমাপ্ত হয়।

আমাদের এখানে 'রুটি-বেটি-ব্যবহার' শব্দ প্রচলিত আছে। প্রথমে রুটি-ব্যবহার জাতির মধ্যেই সীমিত ছিল, কিন্তু এখন এই বন্ধন আলগা হয়ে সব জাতির মধ্যে চালু হয়ে গেছে। তাই জাতিভেদের মানসিকতা ক্রমশ কমছে। বর্তমানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বেটি- ব্যবহারও শুরু হয়ে গেছে। এটা যদি অধিক মাত্রায় চলতে থাকে তাহলে জাতিভেদ সমাপ্ত হয়ে সামাজিক সমতা নির্মাণের পক্ষে সহায়ক হবে— একথা স্পষ্ট। সুতরাং রুটি-বেটি-ব্যবহার— এই বন্ধনকে আলগা করাটা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু বেটি-ব্যবহার রুটি-ব্যবহারের মতো সহজ নয়। একথা মাথায় রেখে, সংযম বজায় রেখে অনুকূল আচরণ করতে হবে। বিবাহের কথা উঠলেই ভালো দম্পতির কথা বিবেচনা করাই স্বাভাবিক। বিবাহ শিক্ষাগত, আর্থিক ও জীবন রচনার সমানতার ভিত্তিতেই হবে। যেভাবে লোকেদের মধ্যে পাশাপাশি ঘর বানিয়ে থাকার প্রবণতা বাড়বে, সমান শিক্ষা ও সুবিধাসহ জাতি-নিরপেক্ষ আর্থিক স্তর উপরে উঠবে, সেইভাবেই স্বাভাবিক একরূপতা সম্ভব হবে। আইন করে বা পয়সার লোভ দেখিয়ে এটা সম্ভব নয়। এটা তড়িঘড়ির বিষয়ও নয়, একথা সকলের মনে রাখতে হবে। সামাজিক পরিবর্তনের এই প্রয়াসে সকলের ব্যক্তিগত যোগদান থাকা চাই।

অস্পৃশ্যতা আমাদের সমাজে ভেদভাবের এক দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক বিষয়। বিচারবান লোকের মতে অতি প্রাচীনকালেও এর অস্তিত্ব ছিল না এবং কালের প্রবাহে বিভিন্ন প্রকারে সমাবিষ্ট হয়ে গোঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে যাই হোক, আমাদের একথা স্বীকার করতেই হবে অস্পৃশ্যতা এক মারাত্মক ভুল এবং একে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হবে (Lock, stock & Barrel)। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। আব্রাহম লিংকন দাসপ্রথা সম্বন্ধে বলেছিলেন— If slavery is not wrong then nothing is wrong, সেই রকম আমদেরও বলা উচিত— 'অস্পৃশ্যতা যদি দোষের না হয় তবে পৃথিবীতে দোষ বলে কিছু নেই।' সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের ধ্যেয় হওয়া উচিত— কীভাবে সামাজিক বিষমতা দূর করা যায়। লোকেদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় বলতে হবে— বিষমতার কারণে কীভাবে সামাজিক দুর্বলতা এসেছে এবং সঙ্ঘর্ষ ঘটছে। একে দূর করার উপায় বলতে হবে এবং এই প্রয়াসে সমস্ত ব্যক্তির যোগদান থাকা চাই।

আমদের ধর্মগুরু, সন্ত, মহাত্মা ও বিদ্বানলোকেদের জনমানসে প্রভাব আছে। একাজে তাঁদের সহায়তা প্রয়োজন। পুরনো বিষয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা আছে এবং তা বজায় থাকুক এটা ঠিক কিন্তু তাঁদের প্রতি আমাদের অনুরোধ যে উপদেশ বা প্রবচনের মাধ্যমে মানুষকে বলুন— আমাদের ধর্মের শাশ্বত মূল্যবোধ কোনটা, আর যুগানুকূলে পরিবর্তনশীল কোনটা। এইভাবে চললে তাঁদের বক্তব্যের অধিক ব্যাপক ও গভীর প্রভাব পড়বে। শাশ্বত অ-শাশ্বতর বিবেচনা যাঁরা করেন সেই আচার্য, মহন্তগণের কথা দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়া চাই। সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের এবং তার জন্য মঠের বাইরে বেরিয়ে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থেকেই পূর্ণ হবে— একথা তাঁদের বুঝতে হবে এবং তদনুরূপ কাজ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। সৌভাগ্যবশত এই বিষয়ে তাঁদের প্রয়াসের শুভ সংকেত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের স্বর্গত সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী সাধু-সন্তদের একসঙ্গে নিয়ে এসে, তাঁদের এই বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এরদ্বারা সুফল হলো যে অনেক ধর্মপুরুষ, সাধু সন্ত সমাজের বিভিন্ন অংশে ঘোরাফেরা করছেন এবং ধর্মান্তরিত বন্ধুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন।

সমাজের অন্য চিন্তাশীল মানুষেরও বড় দায়িত্ব আছে। তাঁদের এমন কিছু পদ্ধতি, পথ দেখানো উচিত, যাতে কাজ হবে কিন্তু সমাজে কটুতা উৎপন্ন হবে না। 'উপায়ং চিন্তয়ন প্রাজ্ঞঃ অপায়মপি চিন্তয়েৎ'— সমাজে সৌহার্দ্য, সামঞ্জস্য ও পরস্পরকে সহযোগিতা করার মতো পরিবেশ তৈরি করার জন্য সমানতা চাই, একথা ভুলে গিয়ে বা না বুঝে যিনি বক্তব্য রাখবেন, লিখবেন বা আচরণ করবেন, তিনি নিশ্চয়ই এই উদ্দেশ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করবেন।

হিন্দু সমাজের কোনো শ্রেণীকে অন্যায় বা অত্যাচারের প্রতিভূ মনে করে অপমান করা, মনে ব্যথা দেওয়া ও হতোদ্যম করা কখনও ঠিক নয়। তাদের মনোবল ঠিক রেখে, নতুন রকমের সামাজিক ব্যবহারের উদাহরণ বা আদর্শ সামনে

রাখা আবশ্যক। বস্তুত, সবাই হিন্দু সমাজেরই অঙ্গ। সুতরাং তাঁদের স্বাভিমান বজায় থাকুক— এটাও মনে রাখতে হবে। জাতি ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতা বিলোপ করতে হলে যারা তা মানে, তাদের মধ্যেও পরিবর্তন আনতে হবে। যারা তা মানে তাদের প্রতি ঠাট্টা, সঙ্ঘর্ষ না করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা আদ্য সরসঙ্ঘচালক ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে কাজ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি বলতেন— আমরা অস্পৃশ্যতা মানি না, পালন করারও দরকার নেই। সঙ্ঘশাখা ও তার কার্যক্রমের রচনাও তিনি সেইভাবেই করেছেন। তখনকার দিনেও কিছুলোক অন্যভাবে ভাবতেন কিন্তু ডাক্তারজীর বিশ্বাস ছিল যে, আজ নয় কাল সকলে এই ভাবনার সঙ্গে সহমত হবেই। তাই তিনি এই ব্যাপারে ঢোল পিটাননি বা কারও সঙ্গে ঝগড়াও করেননি, কারও বিরুদ্ধে অনুশাসন ভঙের অভিযোগও অনেননি। কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে অন্য ব্যক্তিও সৎ মানসিকতাসম্পন্ন। কিছু অভ্যাসের কারণে আপাতত সঙ্কোচ করছে, সময় পেলে নিজের ভুল শুধরে নেবে। সঙ্ঘের প্রাথমিক অবস্থায় এক শিবিরে কয়েকজন বন্ধু মাহার শ্রেণীর বন্ধুদের সঙ্গে ভোজন করতে সঙ্কোচ করছিল। ডাক্তারজী তাদের শিবিরের নিয়ম বলে শিবির থেকে বের করে দেননি। সমস্ত স্বয়ংসেবক, ডাক্তারজী ও আমি একসঙ্গে খেতে বসলাম, যাদের সঙ্কোচ ছিল তারা আলাদা বসল, কিন্তু দ্বিতীয়দিন ভোজনের সময় সবাই একসঙ্গে বসল। এর চেয়েও বেশি জ্বলন্ত উদাহরণ আমার বন্ধু স্বর্গীয় পণ্ডিত বচ্ছরাজজী ব্যাস। তিনি যে শাখার স্বয়ংসেবক, আমি সেই শাখার মুখ্যশিক্ষক ছিলাম। তাঁর ঘরের পরিবেশ পুরনো ও কট্টর হওয়ার কারণে তিনি আমার বাড়িতে ভোজন করতেন না। যখন ইনি প্রথমবার সঙ্ঘ শিবিরে এলেন, তখন ভোজন নিয়ে সমস্যা হলো। সকলের সঙ্গে একত্র রান্না করা ভোজন এক পংক্তিতে বসে খাবেন না। আমি ডাক্তারজীকে বলতে তিনি সঙ্ঘের নিয়ম দেখিয়ে শিবিরে আসতে বাধা না দিতে বললেন। কারণ তাঁর বচ্ছরাজজীর সম্পর্কে বিশ্বাস ছিল যে ভবিষ্যতে অবশ্যই পরিবর্তন হবে। সুতরাং তিনি আমাকে বললেন বচ্ছরাজজী যাতে শিবিরে আসে। তাঁকে আলাদা রান্না করার অনুমতি দেওয়া হবে। প্রথম বর্ষ শিবিরে এই ব্যবস্থাই হলো, কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে বচ্ছরাজজী নিজেই বললেন যে তিনি সকলের সঙ্গে একসঙ্গে ভোজন করবেন। পরবর্তীকালে তিনি যেমন যেমন সঙ্ঘকার্যে যুক্ত হয়েছেন তেমনই তাঁর ব্যবহারে কেমন পরিবর্তন এসেছে তা সর্বজনবিদিত (ধার্মিক স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও)।

অনেক বার হিন্দু সমাজে অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষ ও ঝগড়া হতে দেখা যায়, তার মূল কারণ রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত বিবাদ। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক লোকেরা বা সম্পর্কিত ব্যক্তি ওই বিবাদকে দুই জাতির সংঘর্ষের রূপ দেয়। যাতে নিজেদের গায়ের চামড়া বাঁচিয়ে রাজনৈতিক লাভ তোলা যায়। এই সময় অনেক সৎবুদ্ধিজীবী বা সাংবাদিক বন্ধুও অজ্ঞানতাবশত তাদের মদত দেয়। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঝগড়াকে সম্প্রদায়গত সঙ্ঘর্ষের রূপ দেওয়া হয়, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত ঝগড়াকে বা অত্যাচারকে জাতিগত আখ্যা দেওয়া হয়। এটা কখনই উচিত নয়।

তথাকথিত অবহেলিত বা অস্পৃশ্য বন্ধুরা অনেক অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করেছে। ওদের এটাও মনে রাখতে হবে যে সমাজের সব স্তরের মানুষ অনুভব করে যে এটা ভুল এবং তা বন্ধ হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে সবাই যত্নশীলও বটে। তাঁদেরও আশা (অস্পৃশ্য) যে, অন্যায় সমাপ্ত হয়ে সকলের সঙ্গে সমানতা প্রাপ্ত হোক। সুতরাং সবলোকের এই বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। এই প্রচেষ্টার জন্য পরিপূরক ভাষা ব্যবহার এবং উপযুক্ত আচরণ করা আবশ্যক। সমাজের অন্যায় বিষয়েরও খারাপ নিন্দা অথবা সমালোচনা অবশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেদের সমাজের দোষগুলির প্রতি ব্যথার অনুভব প্রকাশ পাওয়া চাই। বিদেশি লোকেরা যেমন আমাদের পর ভেবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, সেরকম ভাব আমাদের থাকা উচিত নয়। সকলকেই এ বিষয়ে সাবধানতা রাখতে হবে। অতীতের ঝগড়াকে বর্তমানে টেনে এনে ভবিষ্যৎকে বিপদে যেন না ফেলা হয়। আমরা সকলে এই সমাজের অঙ্গ। সুতরাং আমরা অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকব— এইরকম বাস্তবিক আগ্রহ রাখা উচিত। এরকম করলে অবহেলিতদের বিশাল সমাজ ও শক্তি একজোট হয়ে সেই শক্তির ভিত্তিতে আশানুরূপ সমতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হবে।

মহাত্মা ফুলে, গোপালরাও আগরকর, ড. আম্বেদকর প্রমুখ মহাপুরুষ সমাজের কুরীতিতে বড় আঘাত হেনেছেন। কিছু জাতি বা গ্রন্থের প্রতি কড়া সমালোচনাও করেছেন। তার কী প্রয়োজন ছিল বা ওই সময়ের পরিস্থিতি কী ছিল, তা বুঝতে হবে। মানুষ শুরুতে কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষিত করার জন্য বা জনমত জাগরণের জন্য কড়া ভাষা প্রয়োগ করে, কিন্তু সবসময়ের জন্য এরকম করতে থাকা ঠিক নয়। আমার ধারণা, তথাকথিত অবহেলিত বন্ধুরা কারও করুণা চায় না, সবার সঙ্গে সমানতা চায়, তাও নিজেদের পুরুষার্থের দ্বারাই।

এখনও পর্যন্ত অবহেলিত ভাইয়েরা পিছিয়ে থাকার কারণে সবপ্রকার সুযোগ সুবিধা পেতে চায়। এই দাবি ও আশা তাদের ন্যায্য। কিন্তু একদিন না একদিন তাদের সমাজের সমস্ত শ্রেণীর সঙ্গে যোগ্যতার মাপকাঠিতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সমানতা প্রাপ্ত করতে হবে— এটাও তাদের মানতে হবে। অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও হিন্দুদের নিজেদের কিছু বিশেষত্ব আছে। জীবন সম্বন্ধে তাদের কিছু কল্পনা, বিশ্বাস আছে। বিশ্বের চিন্তাশীল লোকেরাও স্বীকার করে যে সমাজে কিছু শাশ্বত মূল্যবোধ স্থাপিত রয়েছে। সুতরাং এই জীবন মূল্যগুলিকে যারা মানেন, আচরণ করেন— তাঁদের দ্বারা নির্মিত একরস, সমতাযুক্ত, সংগঠিত হিন্দুসমাজ খাড়া হলে এই বিশেষত্বগুলি টিকে থাকবে এবং বিশ্বের জন্য উপযোগী হবে। সবাই ঈশ্বরপুত্র, আরও অধিক বললে সবাই ঈশ্বরের অংশ, এই মত পোষণকারী হিন্দুধর্মে উঁচু নীচু ভাবনা নিয়ে ড. আম্বেদকর গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বাস্তবে সমানতা স্থাপিত করার জন্য এর চেয়ে বড় ভিত্তি আর কী হতে পারে? সুতরাং হিন্দুদের একতা আবশ্যক এবং তার ভিত্তি সামাজিক সমতা— এই ভাবনা সব বন্ধুদের করতে হবে এবং রাষ্ট্রকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের সমাজের ইতিহাস খুবই দীর্ঘ এবং ভাবনা ও আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকার জন্য পুরনো গ্রন্থে এমন কিছু বাক্য উল্লেখ আছে যার বিপরীত অর্থ করে বিষয়ের বিপর্যয় করা যেতে পারে। এই সংস্কৃতিতে স্ত্রী জাতিকে তুচ্ছ মানা হয় তার জন্য 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' উল্লেখ করা হয়, আবার অন্যপক্ষে স্ত্রীকে সমাজে কত উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছে বলার জন্য 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যতে রমন্তে তত্র দেবতা' এরকম কথাও বলা হয়েছে। যাঁরা সমাজের একতা চান তাঁদের যা যা বলা আবশ্যক তা সবার সামনে কীভাবে রাখা হবে, বিপরীত ধারণা কীভাবে দূর হবে, কীভাবে সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য তৈরি হবে— সেই লক্ষ্যে সবাইকে প্রয়াস করতে হবে।

(১৯৭৪ সালে পুণাতে 'বসন্ত ব্যাখ্যানমালায়' প্রদত্ত ভাষণ)

সামাজিক সমতা ও সেবাকাজের মূর্ত-পুরুষ বালাসাহেব দেওরস

সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

চেন্নাই অভিমুখী বিমান। অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে ৮০ বছর বয়স্ক একজন যাত্রী। পক্ষাঘাতগ্রস্ত। স্পষ্টভাবে কথা বলার ক্ষমতাও নেই। বিমানবন্দর থেকে তাঁকে হুইল চেয়ারে তোলা হয়েছে। বিমানসেবিকা বার বার তাঁকে দেখছেন। ভাবছেন তাঁকে বুঝি চেন্নাইয়ে ভালো চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চেন্নাইয়ে অবতরণের একটু আগে বিমানসেবিকা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন? উত্তর পেলেন, 'না না, আমি কোনো হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছি না। চেন্নাইয়ে আমার কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধুর বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের পরিবার পরিজনদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি নাগপুর থেকে আসছি।' বিমান সেবিকা বিস্মিত। যাঁর শরীরের অবস্থা এত সঙ্গিন, যে কোনো সময়ে কিছু হয়ে যেতে পারে, এরকম অবস্থায় তিনি যাচ্ছেন অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়াতে! আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? উত্তর পেলেন, 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক' অর্থাৎ সংগঠনের অভিভাবক। বিমান অবতরণের পর যখন তাঁকে আবার হুইল চেয়ারে বসানো হলো তখন বিমান সেবিকা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, 'আপনি সত্যিই মহাত্মা। এই বয়সে, এই অবস্থায় এত কষ্ট করে আপনি অন্যের দুঃখের সহভাগী হতে যাচ্ছেন, আমি আমার জীবনে এমন দেখিনি। আপনি সত্যিকারের মহাপুরুষ।'

সামাজিক সমরসতা এবং বঞ্চিত, পীড়িত, অবহেলিত, শোষিত সমাজ ও মানুষের উত্থানের জন্য সারাদেশে সেবাকাজ বিস্তারিত করাকে জীবন-লক্ষ্য করে নিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক মধুকর দত্তাত্রেয় দেওরস উপাখ্য বালাসাহেব দেওরস। সেবাকাজের দ্বারা সামাজিক উত্থানের পুরোধাপুরুষ রূপে তিনি আজ পরিচিত। বাল্যকাল থেকে জীবনের অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত সমাজের কুরীতি, বিষমতা, দারিদ্র্য দূর করার জন্য তিনি এক সেবা শৃঙ্খল নির্মাণ করেছেন। সেই যোজনা কার্যান্বিত করার জন্য লোক নির্মাণ করে সমাজকে আহ্বান করেছেন, জাগ্রত করেছেন। ১৯৭৪ সালে পুনায় এক নাগরিক সমাবেশে যা বসন্ত ব্যাখ্যামালা নামে পরিচিত, বলেছেন— ''আমাদের সবার মন থেকে সামাজিক ভেদভাব দূর করার লক্ষ্য অবশ্যই থাকা চাই। আমাদের সবার পরিষ্কারভাবে জানা উচিত যে, ভেদভাবের কারণে আমাদের সমাজে কী প্রকার দুর্বলতা এসেছে এবং এর ফলে সমাজ কীভাবে নষ্ট হয়েছে। একে দূর করার চেষ্টায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে।'' ১৯৮৯ সালে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশববলিরাম হেডগেওয়ারের জন্মশতাব্দীবর্ষে তাঁর আহ্বানে সারা দেশে যে সেবা শৃঙ্খল রচিত হয়েছে তাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতি দেশবাসীর সম্মান ও শ্রদ্ধা নির্মাণ হয়েছে।

> সমাজের বঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষদের জন্য যে সেবাশৃঙ্খলের যোজনা তৈরি করে দিয়ে গেছেন তা আজ সারা ভারতে বিশাল আকার ধারণ করেছে। সেই সেবাপুরুষের প্রেরণাই আজ ভারতে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত পঞ্জীকৃত সেবা প্রকল্পের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫২ হাজার। তবু যতক্ষণ দেশের শেষ সারির শেষ মানুষটির কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়া না যাচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর আত্মা অতৃপ্তই থেকে যাবে।

১৯১৫ সালে নাগপুরে তাঁর জন্ম হয়। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার দু'বছর পরে তিনি ডাঃ হেডগেওয়ারের সম্পর্কে আসেন ও স্বয়ংসেবক হন। নাগপুরের মোহিতেওয়াড়ে শাখার স্বয়ংসেবক তিনি। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতার প্রেরণায় তিনি সারা জীবন রাষ্ট্রসেবায় দেওয়ার মনস্থির করেন। সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতির নির্মাণ, কার্যক্রমের বিকাশে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। গণবেশ, শারীরিক ও বৌদ্ধিক কার্যক্রম, গণগীত ইত্যাদি নিশ্চিত করায় তিনি প্রধান ভূমিকায় ছিলেন।

প্রখর বুদ্ধিমান বালাসাহেব ছাত্রজীবনে সমস্ত পরীক্ষায় প্রথমস্থান লাভ করেন। পড়াশুনা শেষ করে তিনি নাগপুরেই 'অনাথ

বিদ্যার্থী বসতি গৃহ' নামে এক বিদ্যালয়ে দু' বছর নিঃশুল্ক শিক্ষকতা করেন। এই সময়ে তিনি নাগপুর নগর কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেন। তখন তিনি শাখা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শীত শিবির, বনভোজন, সহভোজ এবং স্বয়ংসেবকদের গুণাত্মক বৃদ্ধির জন্য নৈপুণ্যবর্গ ইত্যাদির প্রচলন করেন।

তিনি বাল্যকাল থেকেই খোলা মনের মানুষ ছিলেন। সে সময়ে সমাজে প্রচলিত ছোঁয়াছুঁয়ি, খাওয়াদাওয়া, জাতিভেদ ইত্যাদির তিনি প্রবল বিরোধী ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে তাঁর সব শ্রেণীর বন্ধুরা আসতেন। সবাই একসঙ্গে খেতেন। বিশেষ বিশেষ দিনে শাখার বন্ধুদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে রান্নাঘরে বসেই খেতেন। তাঁর এরকম কাজকর্মে প্রথম প্রথম বাড়িতে বকা খেতেও হয়েছে। কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। তাঁর মন থেকে বলা কথাটি এখন আপ্তবাক্যের মতো হয়ে আছে— 'অস্পৃশ্যতা যদি পাপ না হয়, পৃথিবীতে পাপ বলে কিছু নেই।' মোহিতেওয়াড়ে শাখার 'কুশপথক'-এর স্বয়ংসেবক ছিলেন। পথককে এখন গট বলা হয়। এই গটে প্রতিভাবান ছাত্রদেরই রাখা হতো।

১৯৩৯ সালে বালাসাহেব বাঙ্গলার প্রান্ত প্রচারকের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় আসেন। কিন্তু ১৯৪০ সালে ডাক্তারজীর মৃত্যুর পরে তাঁকে নাগপুরে ডেকে নেওয়া হয়। ছ' মাসের মধ্যেই বাঙ্গলায় সঙ্ঘকাজের গোড়াপত্তন করে দিয়ে যান। ১৯৪০-এর পর প্রায় ৩২ বছর তাঁর গতিবিধির কেন্দ্র নাগপুরকে কেন্দ্র করেই ছিল। তিনি নাগপুরের সঙ্ঘকাজ সারা দেশের সামনে আদর্শরূপে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি দূরদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। সঙ্ঘের প্রাতঃস্মরণে আমাদের রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক পরম্পরার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি রাখা হয়েছিল। প্রথমে হিন্দুধর্মের পরম্পরা গুলিকেই শ্লোকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বালাসাহেব দেওরসের পরামর্শে তাতে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ধর্মের মানবিন্দুগুলিকে যুক্ত করা হয়। ভারতের উন্নতির জন্য যা কিছু মঙ্গলজনক সবই তাতে সে সময় সন্নিবিষ্ট করা হয়। সারা ভারতকে একসূত্রে বাঁধার উদ্দেশ্যে রচিত এই শ্লোকগুলিকে তাঁর ইচ্ছানুসারে এখন একাত্মতা মন্ত্র বলা হয়।

লোক সংস্কারের কেন্দ্র সঙ্ঘ শাখার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তিনি সমাজের সামনের অতি সরল ভাষায় রেখেছেন : ''সঙ্ঘের শাখা কেবল খেলাধুলা বা কুচকাওয়াজ করার স্থান নয়, আড়ম্বরহীন ভাবেই সজ্জনদের সুরক্ষার অভিব্যক্তি, তরুণ-যুবকদের কু-অভ্যাসাদি থেকে মুক্ত রাখার সংস্কারপীঠ, সমাজের ওপর আগত আকস্মিক বিপত্তি বা সঙ্কটে দ্রুত ও পক্ষপাতহীন সহায়তা দানের আশাকেন্দ্র, মহিলাদের নির্ভয়তা এবং সুসভ্য আচরণ প্রাপ্তির আশ্বাসস্থল, দুষ্ট ও দেশদ্রোহী শক্তির ওপর নিজ প্রভাব স্থাপনকারী শক্তি। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ্য কর্মী যাতে পাওয়া যায় তার প্রশিক্ষণ দানকারী বিদ্যাপীঠ হলো সঙ্ঘশাখা।''

তখন সারা দেশের সঙ্ঘশিক্ষাবর্গে নাগপুর থেকে শিক্ষক পাঠানো হতো। নাগপুর থেকে বেরিয়ে প্রচারকরা সারা দেশে শাখা দাঁড় করিয়েছেন। প্রচারকরূপে সারা দেশে পাঠানোর জন্য প্রচারকদের একটি বাহিনী নির্মাণের শ্রেয় সর্বতোভাবে বালাসাহেবজীরই প্রাপ্য। শুধু তাই নয়, যে প্রচারকদের দেশের অন্যপ্রান্তে পাঠানো হচ্ছে তাদের বাড়ির সমস্ত বিষয়ে চিন্তাভাবনা তিনিই করতেন। এছাড়া যে প্রচারকরা ৫ অথবা ১০ বছর কাজ করে ফিরে আসতেন তাদের চাকরিবাকরি, ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেওয়ার দায়িত্বও তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। নাগপুর থেকে যে প্রচারকদের দল সারা দেশে পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে তাঁর ভাই ভাউরাও দেওরসও ছিলেন। ভাউরাও লখনউ-য়ে সঙ্ঘকাজে গতি প্রদান এবং একাত্ম মানবদর্শনের প্রণেতা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ও অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো মানুষদের সঙ্ঘকাজে যুক্ত করেন।

১৯৬৫ সালে সরকার্যবাহ এবং শ্রীগুরুজীর প্রয়াণের পর ১৯৭৩ সালে সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। তাঁর কুশল নেতৃত্ব, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সমাজের প্রতি প্রেম লক্ষ্য করে শ্রীগুরুজী একবার কোনো কার্যক্রমে তাঁর পরিচয় করাতে গিয়ে বলেছিলেন, ''সঙ্ঘের মধ্যে দু'জন সরসঙ্ঘচালকের পদ যদি থাকতো তাহলে নিঃসন্দেহে এই যুবক আর একজন সরসঙ্ঘচালক হতেন।'' সরসঙ্ঘচালক হয়ে বালাসাহেবজী সঙ্ঘকাজে গতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সারা দেশে ভ্রমণ করেন। তাঁর সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব গ্রহণের দু'বছর পরেই ১৯৭৫ সালের ৪ জুলাই ইন্দিরা গান্ধী ঘৃণ্য রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সে সময় সঙ্ঘের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা তিনি ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন। তাঁকে ২১ মাস পুনের যারবেদা জেলে বন্দি রাখা হয়। জেলের মধ্যে তাঁর উদার চিন্তাভাবনা ও ব্যবহারে বন্দি থাকা অনেক রাজনৈতিক দলের কার্যকর্তা ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি সঙ্ঘের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর প্রেরণাতেই কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা বাদে বহু সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিকদলের কার্যকর্তারা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী শক্তিশালী সত্যাগ্রহ করেন। পরিণামস্বরূপ সঙ্ঘের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় এবং ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে স্বৈরাচারী ইন্দিরা সরকার তথা কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় হয়। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর পুত্র সঞ্জয় গান্ধীও নির্বাচনে হেরে যান। সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের প্রতি বালাসাহেবজীর গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। সরসঙ্ঘচালক হওয়ার পর তিনি কার্যকর্তাদের 'দেবদুর্লভ' বলে উল্লেখ করেছেন। জরুরি অবস্থায় তিনি কারাগারে বন্দি ছিলেন। তবু যোজনাবদ্ধভাবে স্বয়ংসেবকরা সত্যাগ্রহ করে বিভিন্ন জেলে যাচ্ছেন। জেলের মধ্যে অনুশাসনবদ্ধ কার্যক্রম চলছে। বাইরে জনসঙ্ঘর্ষ সমিতির নামে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। এসবেরই নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ংসেবকরা। অন্য দলের নেতারা জেলের মধ্যে বালাসাহেবকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি তো জেলের মধ্যে, এত সূচারুভাবে এসব কীভাবে চলছে? বালাসাহেবজী তাঁদের উত্তর দিয়েছিলেন, 'ওরা তো একজন সরসঙ্ঘচালককে গ্রেপ্তার করেছে। বাইরে চারজন সরসঙ্ঘচালক নেতৃত্ব দিচ্ছেন।' কী অপূর্ব বিশ্বাস!

১৯৮৩ সালে তামিলনাড়ুর মীনাক্ষীপুরমে একদিনে কয়েক হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করে মুসলমান করা হয়। এই ঘটনা

দেশের হিন্দুদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য বালাসাহেবজীর পথনির্দেশে 'একাত্মতা যাত্রা' বের করা হয়। এ সময় লক্ষ লক্ষ হিন্দুজনতা ভারতমাতা ও গঙ্গাজলের নামে একত্রিত হয়। হিন্দুদের মনোবল বেড়ে যায়। এই যাত্রার মাধ্যমে দেশে অভূতপূর্ব জনজাগরণ হয়।

সবাই জানেন, শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনে দেশে হিন্দুশক্তির এক অপূর্ব রূপ দেখা গেছে। এই আন্দোলনে দেশের প্রায় সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন যুক্ত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ স্বাভিমানী হিন্দুজনতা ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর শ্রীরামজন্মভূমির ওপর কলঙ্কিত বাবরি ধাঁচা হটিয়ে দেয়। এরপর দেশ ও বিদেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দল ও মুসলমান মৌলবাদীরা হাওয়া গরম করতে থাকে। আজও তাদের ধ্বংস হওয়া বিতর্কিত ধাঁচার জন্য মায়াকান্না কাঁদতে দেখা যায়।

সেই সময় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস খুব জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, যখন শ্রীরামজন্মভূমিতে এক বিতর্কিত ধাঁচা ভেঙে ফেলা হলো তখন সারা দুনিয়ার মুসলমানরা 'হায় তোবা, হায় তোবা' চিৎকার করছেন। কিন্তু যখন হিন্দুদের অগণিত মঠ-মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে, ধন-সম্পদ লুঠ করা হয়েছে, তখন হিন্দুদের কত দুঃখ হয়েছে, মুসলমান সমাজ কি এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছে?

সেই সময় সঙ্ঘ চাইলে শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ করতে পারতো। কিন্তু বালাসাহেবজীর যুক্তি ছিল, তাহলে লোকের মনে হতো এই মন্দির সঙ্ঘ অথবা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের। তিনি মনে করতেন, অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির নির্মাণে সবার অংশগ্রহণ হওয়া উচিত। এই দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির ও রাজনৈতিক দলের শ্রীরামমন্দির নির্মাণে এগিয়ে আসা উচিত।

সরসঙ্ঘচালক থাকার সময় বালাসাহেবজী সঙ্ঘকাজের বহুমুখী বিস্তার ঘটান। তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বস্তিতে চলা সেবাকাজ। এর ফলে সেখানে ধর্মান্তরণ বন্ধ হয়েছে। স্বয়ংসেবকরা স্থানীয়ভাবে বহু সেবা সংগঠন শুরু করেছেন। বালাসাহেবজী প্রবীণ প্রচারকদের ওই সংগঠনের দায়িত্ব দিয়ে তার অখিল ভারতীয় রূপ দিয়েছেন। তাঁর কার্যকালেই মহকুমা পর্যন্ত শাখার বিস্তার হয়। সঙ্গে আনুষিক সংগঠনেরও পর্যাপ্ত শক্তি বৃদ্ধি হয়।

১৯৮৮-'৮৯-এ সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা তথা আদ্য সরসঙ্ঘচালক ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষ পালন করা হয়। এ সময় ডাক্তারজীর জীবনী গ্রামে গ্রামে প্রচার করা হয়। এই সময়েই তাঁর আহ্বানে সর্বাধিক প্রচারক সঙ্ঘকাজের জন্য বের হয়। বঙ্গপ্রদেশেও ১০০ জন তরতাজা শিক্ষিত যুবক প্রচারকরূপে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন সঙ্ঘের প্রান্তস্তর অথবা বিবিধক্ষেত্রের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনিই সমাজে 'হিন্দু জাগে তো বিশ্ব জাগেগা' এবং 'নর সেবাই নারায়ণ সেবা'-র মতো কথা চালু করেন। এই কথা শুধু স্লোগানে না থেকে কাজে পরিণত হয়েছে। তিনি দেখে যেতে পেরেছেন স্বয়ংসেবকরা সারাদেশে হাজার হাজার সেবাপ্রকল্প চালাচ্ছেন। উল্লেখযোগ্য যে, বালাঘাটের কারঞ্জায় তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে তিনি সেই ধনরাশি দিয়ে নাগপুর-ওয়ার্ধা রোডস্থিত খাপরিতে ২০ একর জমি কেনেন। ১৯৭০ সালে এই কৃষিজমি ভারতীয় উৎকর্ষ মণ্ডলকে দান করেন। এই জমিতে এখন গ্রামের বালক-বালিকাদের জন্য স্কুল, গোশালা এবং স্বামী বিবেকানন্দ মেডিক্যাল মিশন নামে একটি হাসপাতাল গ্রামের লোকেদের সেবার জন্য কাজ করে চলেছে।

প্রচণ্ড ডায়াবেটিক রোগ সত্ত্বেও তিনি ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করেন। যখন আর পারছিলেন না, তখন কার্যকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর দায়িত্ব রজ্জু ভাইয়াকে সমর্পণ করার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন— তাঁর দাহসংস্কার একজন সাধারণ লোকের মতো এক সাধারণ শ্মশানেই যেন করা হয়। জীবিতকালে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তাতে দু'টি কথা ছিল— এক, তাঁর নামে কোথাও যেন স্মারক নির্মাণ করা না হয়। দুই, সঙ্ঘের কার্যক্রমে আদ্য সরসঙ্ঘচালক ডাঃ হেডগেওয়ার এবং দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর চিত্র ছাড়া আর কোনো সরসঙ্ঘচালকের চিত্র যেন না রাখা হয়।

চেন্নাই বিমানবন্দরে অবতরণের পর তাঁর আগ্রহ ছিল তাঁকে যেন স্থানীয় কোনো কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখান থেকে তিনি বোমা বিস্ফোরণে নিহতদের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। চিকিৎসকরা দেখলেন তখন তাঁর রক্তচাপ ১৮০/১১০। রক্তচাপ কম হওয়ার জন্য তাঁকে ট্যাবলেট দেওয়া হচ্ছিল। তাঁরা চিন্তিত ছিলেন এ অবস্থায় কীভাবে তাঁকে কার্যালয়ে রাখা যায়, যেখানে কোনো ভালো ব্যবস্থাই নেই। বিকেলে তাঁর রক্তচাপ ২২০/১২০-তে উঠে যায়। ডাক্তারবাবুরা চিন্তিত, যে কোনো সময় কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।

তাঁকে কার্যালয়েই আনা হয়েছিল। বিকেলে বিস্ফোরণে নিহত হতাত্মাদের আত্মীয়-স্বজন মিলে ২০০ জন এসেছিলেন। বাইরে সামিয়ানার তলায় রাখা চিত্রে হুইল চেয়ারে বসেই ফুল, মালা ও ধূপ দিলেন। তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে এক এক করে কথা বললেন। তাঁদের প্রিয় সরসঙ্ঘচালক এসেছেন সমবেদনা জানাতে, তাই তাঁদের চোখে জল। সরসঙ্ঘচালকের চোখেও জল। তখন সবার চোখের ভাষা যেন ছিল— 'আপনি সত্যিকারের মহাত্মা'। কার্যক্রম শেষে প্রার্থনার পর চিকিৎসকরা আবার তাঁর রক্তচাপ দেখলেন— ১২০/৯০। স্বাভাবিক। মনে হলো এবার তিনি একটু শান্তি অনুভব করলেন।

সমাজের জন্য সমর্পিত প্রাণ এই 'মহাত্মা' ১৯৯৬ সালের ১৭ জুন পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে নাগপুরের সাধারণ মানুষের জন্য শ্মশানঘাটে তাঁর দাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সমাজের বঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষদের জন্য যে সেবাশৃঙ্খলের যোজনা তৈরি করে দিয়ে গেছেন তা আজ সারা ভারতে বিশাল আকার ধারণ করেছে। সেই সেবাপুরুষের প্রেরণাই আজ ভারতে স্বয়ংসেবকদের দ্বারা পরিচালিত পঞ্জীকৃত সেবা প্রকল্পের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫২ হাজার। তবু যতক্ষণ দেশের শেষ সারির শেষ মানুষটির কাছে সেবা পৌঁছে দেওয়া না যাচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর আত্মা অতৃপ্তই থেকে যাবে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

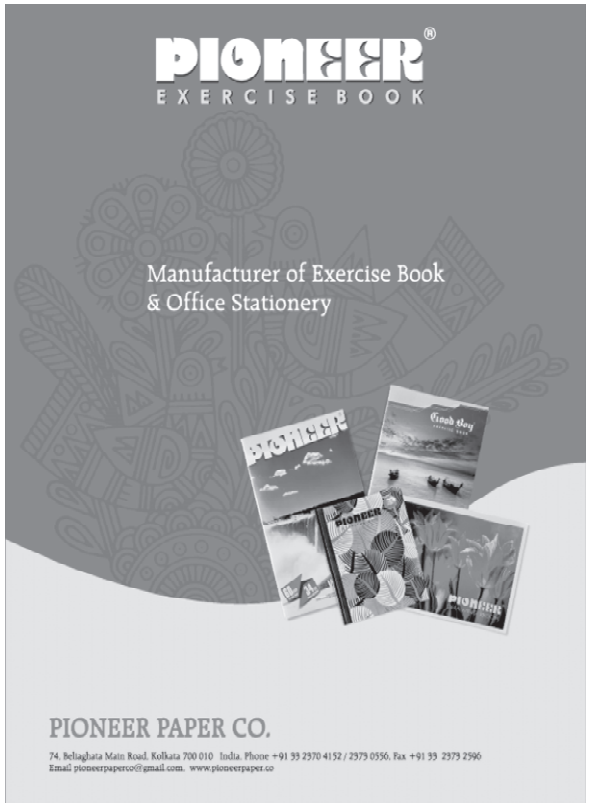

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫